মহাযুদ্ধের ঘোড়া

(স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্তিম পর্ব)

প্রফুল্ল রায়

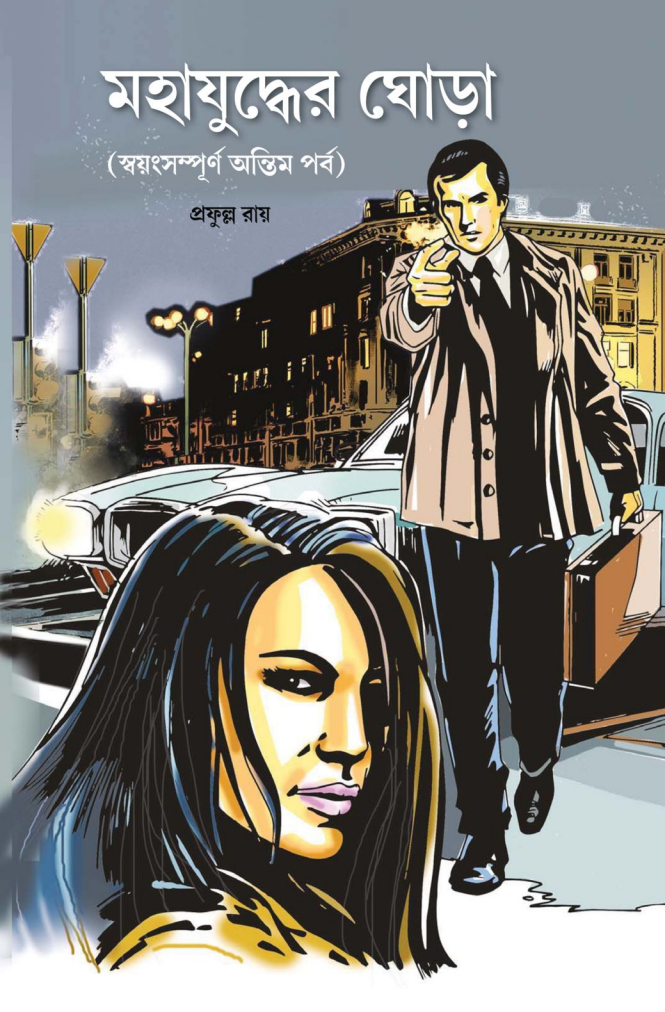

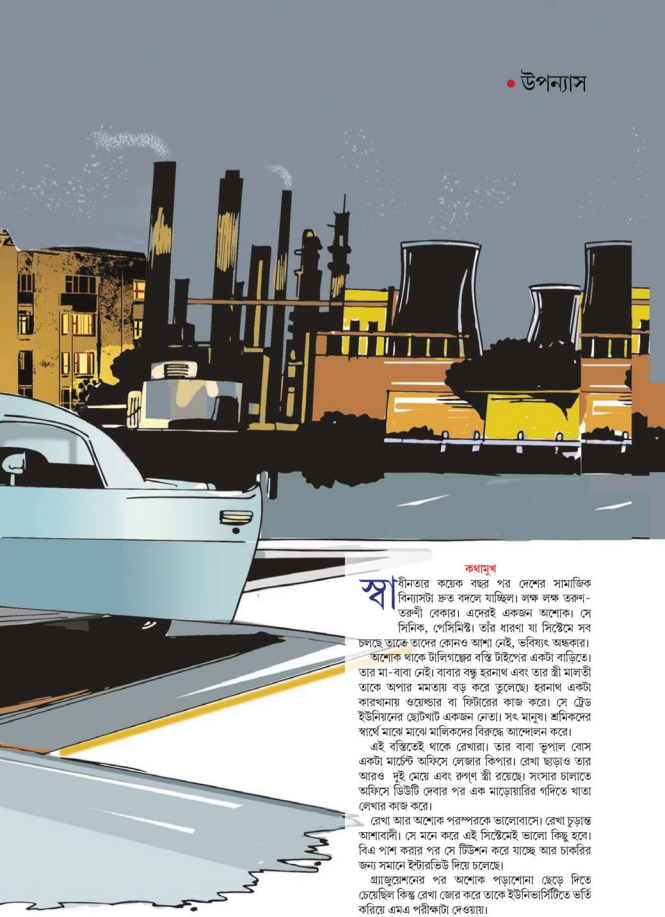

কথামুখ

স্বাধীনতার কয়েক বছর পর দেশের সামাজিক বিন্যাসটা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী বেকার। এদেরই একজন অশোক। সে সিনিক, পেসিমিস্ট। তাঁর ধারণা যা সিস্টেমে সব চলছে তাতে তাদের কোনও আশা নেই, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

অশোক থাকে টালিগঞ্জের বস্তি টাইপের একটা বাড়িতে। তার মা-বাবা নেই। বাবার বন্ধু হরনাথ এবং তার স্ত্রী মালতী তাকে অপার মমতায় বড় করে তুলেছে। হরনাথ একটা কারখানায় ওয়েল্ডার বা ফিটারের কাজ করে। সে ট্রেড ইউনিয়নের ছোটখাট একজন নেতা। সৎ মানুষ। শ্রমিকদের স্বার্থে মাঝে মাঝে মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে।

এই বস্তিতেই থাকে রেখারা। তার বাবা ভূপাল বোস একটা মার্চেন্ট অফিসে লেজার কিপার। রেখা ছাড়াও তার আরও দুই মেয়ে এবং রুগ্ণ স্ত্রী রয়েছে। সংসার চালাতে অফিসে ডিউটি দেবার পর এক মাড়োয়ারির গদিতে খাতা লেখার কাজ করে।

রেখা আর অশোক পরস্পরকে ভালোবাসে। রেখা চূড়ান্ত আশাবাদী। সে মনে করে এই সিস্টেমেই ভালো কিছু হবে। বিএ পাশ করার পর সে টিউশন করে যাচ্ছে আর চাকরির জন্য সমানে ইন্টারভিউ দিয়ে চলেছে।

গ্র্যাজুয়েশনের পর অশোক পড়াশোনা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু রেখা জোর করে তাকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে এমএ পরীক্ষাটা দেওয়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দেশের একজন টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সোমদেব চ্যাটার্জি মাননীয় অতিথি হিসেবে এলেন। তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন। ডিগ্রি নেবার পর উপাচার্য এবং সোমদেবকে সৌ দেবিয়ে অশোকে জানতে চায়, এটা কোনও অফিসে দেখালে কোথাও কি চাকরি পাওয়া যাবে? ইউনিভার্সিটি কি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে? উপাচার্য অশোকের আচরণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি দিতে পারে, চাকরি নয়। অশোক সোমদেবকে জিগ্যেস করে, ডিগ্রিটার জোরে তাঁর হাউসে কিছু জুটতে পারে?

উপাচার্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, 'উনি আমাদের রেসপেক্টেড গেস্ট। ওঁকে তুমি এভাবে অসম্মান করতে পারো না।'

অশোক বলে, 'তাহলে ছেলেবেলা থেকে আমরা যোলো-সতেরো বছর স্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে কাটিয়ে ডিগ্রির এই চোতা কাগজটা পেলাম তা দিয়ে কী হবে? মাদুলিতে ভরে গলায় ঝুলিয়ে রাখব?' বলেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ডিগ্রিটা উড়িয়ে দিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধায়। উপাচার্যের নির্দেশে তাকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

শিল্পপতি সোমদেব চ্যাটার্জি এমন অদ্ভুত যুবক আগে কখনও দেখেননি। অশোক সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল হচ্ছিল। পরদিন একটা লিমুজিন পাঠিয়ে তিনি অশোককে নিজের বিশাল বাড়িতে নিয়ে যান। নানারকম কথাবার্তার ফাঁকে অশোক বলে, শিল্পপতিরা ইচ্ছা করলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেশের চেহারা বদলে দিতে পারেন।

সোমদেব বলেন, 'তুমি তাই মনে করো?'

অশোক জানায়, 'তেমনটাই তার বিশ্বাস।'

সোমদেব বলেন, 'তোমাকে আমি আমার জায়গায় বসিয়ে দেব। যা বলবে তা পারবে?'

অশোক চ্যালেঞ্জটা নেয়। সোমদেব তাকে তাঁদের বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের সর্বেসর্বা করে দেন। টালিগঞ্জের বস্তি থেকে অশোক গুন্ড বালিগঞ্জের এক বিলাসবহুল বিল্ডিংয়ে উঠে আসে। দস্তুর অনুযায়ী তাকে নামকরা ক'টা ক্লাবের মেম্বার করে দেওয়া হয়। জীবনটাই তার পুরোপুরি বদলে যায়। কিন্তু নিজের লক্ষ্যে সে অবিচল থাকে। নিজেদের হাউসেই শুধু নয়, অন্যান্য শিল্পপতিদেরও সে বেকার যুবকদের জন্য কিছু করতে অনুরোধ করে। স্বাধীন ভারতে এটা একটা সামাজিক দায়।

অশোকের পরিচিত বহু শিক্ষিত বেকার ছেলে তার কাছে চাকরি বাকরির জন্য কাকুতি-মিনতি করে। কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হয়না। এই যুবকেরা তার ওপর খেপে ওঠে।

এদিকে সারা দেশের শিল্প জগতে অটোমেশন, অফিসে অফিসে কম্পিউটার বসতে শুরু করেছে। এই নিয়ে তুমুল শ্রমিক আন্দোলন শুরু হল। অশোক সাময়িকভাবে সেটা বন্ধ করতে পারল।

সোমদেবের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসার পর অশোক এতটাই ব্যস্ত যে টালিগঞ্জে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। বাবার মতো সময়ই নেই। রেখার সঙ্গে কখনও সখনও ফোনে কথা হয়।

এদিকে বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট স্যর হরিকিষণ দেশাইয়ের মেয়ে লীনার সঙ্গে অশোকের আলাপ হয়। আগুনের ঝলকের মতো চেহারা। একদিনও বস্তিতে না গিয়ে ভারতীয় শহরগুলোর বস্তিজীবন, সেখানকার পরিবেশ নিয়ে থিসিস লিখে আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট হয়েছে। অশোককে তার ভীষণ ভালো লাগে। লীনা চায় ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার শিল্পজগৎ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আসুক। ফিরে এসে সেই অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগাক। এখনও বিবেচনে যাওয়া হয়নি।

অশোক সমাজের কোন স্তর থেকে উঠে এসেছে, এক লহমার জন্যও সে তা ভোলে না। তাদের কোম্পানিগুলোতে বেকার ছেলেদের জন্য কর্মসংস্থানের পরিসর বাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের হাউসে রয়েছে পাঁচজনের হাই-পাওয়ার কমিটি। তার প্রেসিডেন্ট অশোক হলেও বাকি চার মেম্বার হলেন এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের চারজন অভিজ্ঞ, ঘাঘু ডিরেক্টর। কমিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হাউসের যাবতীয় পলিসি ঠিক করে। কোনও একজনের ইচ্ছামতো কিছু করা যায় না। কমিটি মেম্বাররা সহমত না হলে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মেম্বাররা একমত হলে তবেই সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হয়। অশোক বেকার যুবকদের জন্য যে উদ্যোগই নিতে চায় তা অন্য মেম্বাররা কৌশলে তা বানচাল করে দিতে থাকে। অশোক হাল ছাড়ে না। যে উদ্দেশ্যে তার এই হাউসে আসা তা তাকে পূরণ করতেই হবে। সেটাই তার পাখির চোখ।

কাহিনী

কিছুক্ষণ আগে হাই-পাওয়ার কমিটির চারজন মেম্বার মিস্টার বিলিমোরিয়া, মিস্ট্রার সান্ধু, মিস্টার আগরওয়াল এবং মিস্টার ভট্টাচারিয়াকে ফোন করে আজ দুপুর দুটোয় তার চেম্বারে আসতে অনুরোধ করেছিল অশোক। ফোন পেয়ে বিলিমোরিয়ারা বেশ অবাকই হয়েছিলেন, তবে তাঁদের বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের চোয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশোক ব্যানার্জি যখন ডেকেছেন, নিশ্চয়ই জরুরি কোনও কারণ আছে। তাঁরা তক্ষুনি জানিয়ে দিয়েছিলেন অবশ্যই আসবেন।

হঠাৎ কিছু খেয়াল হতে সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলল অশোক। চারজনকেই ফের ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করল, 'আজ নয়, নেক্সট উইকে ফিফটিনথ এপ্রিল আমরা একসঙ্গে বসব। আপনাদের ভ্যালুয়েবল অ্যাডভাইস আমার প্রয়োজন। কোন বিষয়ে, এখন সেটা বলছি না। তারিখ বদলের জন্য ক্ষমা চাইছি।'

তার প্রাইভেট সেক্রেটারি চন্দ্রকান্ত রাহেজা অর্ধবৃত্তাকার বিশাল টেবিলটার ওধারে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফোন নামিয়ে রেখে অশোক বলল, 'এ কী, আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন-বসুন—'

রাহেজা নিঃশব্দে বসে পড়লেন।

অশোক বলল, 'আমি আপনার কাছে একটা ইনফরমেশন চাইছি। না না, ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়।'

তিন মাস কয়েকদিন হল অশোক এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের সর্বেসর্বা হয়ে এসেছে। বয়স বড়জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ। অনেকদিন এই হাউসে কেটে গেল রাহেজার। ট্রাডিশনাল শিল্পপতিদের দেখেছেন তিনি। সব এক ছাঁচে গড়া। কিন্তু অশোক একেবারে অন্যরকম। বস্তির ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসেছে। ভীষণ জেদি, একগুঁয়ে, যা বলার স্পষ্ট ধারালো ভাষায় বলে। তার একমাত্র পাখির চোখ হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে বিপ্লব ঘটিয়ে মান্ধাতার আমলের ট্রাডিশন ভেঙেচুরে সোশ্যাল প্যাটার্নকে বদলে দেওয়া। সবাই বলে অশোক ব্যানার্জি ইজ আ রিবেল ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড। রাহেজা তাকে পছন্দ করেন, শ্রদ্ধাও। জিগ্যেস করলেন, 'কী ইনফরমেশন স্যর?'

'আমি রিসেন্টলি জেনেছি, আমেরিকা আর জার্মান কোলাবরেশনে আমাদের হাউস তিনটে কি চারটে ফ্যাক্টরি বানাচ্ছে।'

'ঠিকই শুনেছেন স্যর। আপনি এই হাউসে আসার অনেক আগে থেকেই ওগুলোর কাজ শুরু হয়েছিল। দু'এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

'কারখানাগুলো কোথায় হচ্ছে?'

'বেঙ্গলের বাইরে।'

'আই সি। এগুলো কীসের ফ্যাক্টরি?'

'ছোট ছোট মেশিন পার্টসের।'

'কত জনের এমপ্লয়মেন্ট হতে পারে?'

মনে মনে হিসেব করে রাহেজা বললেন, 'হাজার দেড়েকের মতো।'

আর কোনও প্রশ্ন না করে দেওয়ালের গায়ে কাচের র‍্যাকের

দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল অশোক, 'ওখানে ব্রাউন রংয়ের যে ফাইলটা রয়েছে, প্লিজ নিয়ে আসুন'

ফাইল এসে গেল। রাহেজার হাত থেকে সেটা নিয়ে খুলে একটা পাতা বের করল। অশোক একটু ঝুঁকে দেখতে দেখতে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলল, 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বেঙ্গলের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাটা একচল্লিশ লাখ, আশি হাজার সাতশো।' তারপরেই মুখ তুলে চন্দ্রকান্ত রাহেজার দিকে ফাইলটা এগিয়ে দিল, 'আপনাকে আরেকটু কষ্ট দিচ্ছি। এটা র‍্যাকে রেখে আসুন।—'

চন্দ্রকান্ত অবাক। তাঁদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের নতুন চেয়ারম্যান-কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মতিগতি তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। হঠাৎ কেনই বা ফরেন কোলাবরেশনে অন্য প্রভিন্সে নতুন প্ল্যান্টগুলোর খবর নিলেন, তারপরেই ফাইল ঘেঁটে কেনই বা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাটা খুঁজে বের করলেন, কে জানে। ধন্দ-ধরা মানুষের মতো ফাইলটা রেখে ফিরে আসতেই অশোক তাঁকে বলল, 'আপনি আপনার চেম্বারে গিয়ে বসুন। দরকার মতো ডেকে নেব।'

রাহেজা চলে গেলেন।

টালিগঞ্জে সেদিন রশেশ, ভল্টাদের হাতে বেদম মার খেয়ে জখম হবার পর বেশ কয়েকদিন নার্সিংহোমে কাটিয়ে ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতেও প্রায় সপ্তাহখানেক রেস্ট নিয়ে অফিসে আসতে শুরু করেছে অশোক। কলকাতার নামকরা ডাক্তারদের নিয়ে যে মেডিক্যাল বোর্ড বারবার তার শরীরের আগাপাশতলা পরীক্ষা করে আরও কিছুদিন রেস্ট নিতে বলেছিল। অশোক রাজি হয়নি। দেশের একজন টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে তো জোর করে আটকে রাখা যায় না। প্রচুর টাকা ফী মেলে। তাই পুরোপুরি না হলেও এঁদের মর্জিমাফিক কিছুটা হলেও চলতে হয়।

মেডিক্যাল বোর্ডের সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক চিকিৎসক ডাক্তার ঘোষদস্তিদার বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, অফিসে আপনি যেতে পারেন, তবে বেশি প্রেশার নেবেন না। সেটা আপনার হেলথের পক্ষে হামফুল হবে।'

ঠিকই অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন ডাক্তার ঘোষদস্তিদার। অফিসে জয়েন করার পর কতরকম চাপ যে কতদিক থেকে আসছে।

রাহেজা পাশের চেম্বারে চলে যাবার পর অশোকের মনে হল কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। একবার ভাবল বাড়ি ফিরে যায়। পরক্ষণে ঠিক করল, যাবে না। একটু দূরে তার পিএ পার্ল শেঠনা তার টেবিলে বসে আছে। অশোক যখন যে হুকুম দেয় সেটা তামিল করাই তার ডিউটি।

ডাক্তার ঘোষদস্তিদার একটা প্রেসক্রিপশান লিখে দিয়ে বলেছিলেন, 'ব্লাডপ্রেশার আর হার্টের ওষুধ। যেখানেই যান এগুলো সঙ্গে রাখবেন।'

এতকাল অশোক শুনে এসেছে হার্ট আর প্রেশারের সমস্যাগুলো কোটিপতিদের। তাদের মতো বস্তিবাসীদের নয়। তবে কি সে বস্তির লোয়ার মিডল ক্লাস লেভেল থেকে এই ক'মাসে একেবারে অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির চূড়োয় উঠে এসেছে। স্বপ্নেও এমনটা ঘটে না। তার হাসিই পেয়েছিল।

ডাক্তার ঘোষদস্তিদারের পরামর্শটা অশোক উপেক্ষা করেনি। সঙ্গে তার এই ওষুধ দুটো থাকে। অফিসেও কয়েকটা ট্যাবলেট এনে রেখেছে।

হার্টবিটটা বেড়ে গেছে। মাথার পেছন দিকটা চিন চিন করছে। লক্ষণটা অশোকের চেনা। শরীরটা চেয়ারের পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'মিস শেঠনা, বেয়ারাকে জল দিয়ে যেতে বলুন—'

জল এলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে খেয়ে ফেব শরীর হেলিয়ে দিল। ধীরে ধীরে তার চোখ বুজে এল।

পার্ল তার দিকে লক্ষ রাখছিল। একটু উদ্বেগের সুরে জিগ্যেস

করল, 'আর য়ু ফিলিং আনওয়েল স্যর? রাহেজা সাহেবকে কি ডাকব?'

চোখ না খুলেই অশোক বলল, 'না না, তেমন কিছু নয়। মিনিট দশেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। রাহেজাকে ডাকার দরকার নেই। খুব ইমপর্টান্ট ফোন না এলে আমাকে দেবেন না।' আর কিছু বলতে সাহস হল না পার্লের। কিন্তু উৎকণ্ঠাটা থেকেই গেল।

॥ দুই ॥

মিনিট দশবারো পর মাথার পেছন দিকের চিনচিনে ব্যথাটা আর নেই। হার্টবিটও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অশোক চোখ মেলে সোজা হয়ে বসল। তারপরেই কী ভেবে পার্লের দিকে তাকাল।

পার্ল তার দিকে পলকহীন, উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। অশোক একটু হাসল, 'টেনশন করবেন না মিস শেঠনা। আমার ব্যাকআউন্ড তো আপনি ভালোই জানেন। পার্টিশনের পর রিফিউজি হয়ে কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর থেকে ব্লামডোয়েলার— বস্তিবাসী। কত স্ট্রাগল করে বেঁচে থাকতে হয়েছে, ইউ জাস্ট কাণ্ট ইমাজিন। অসুখ টসুখ যে আমাদের হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রেশার, সুগার, হাই প্রবলেম—এসব বস্তির ধারেকাছে ঘেঁষে না।' বলতে বলতে হাত নাচাতে লাগল, 'তিন মাস কয়েকদিন আমি এই হাউসে এসেছি। আমার স্টেটাস ও পালটে গেছে। বেকার, সিনিক, আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন বস্তির এক যুবক থেকে বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাম্রাজ্যের চেয়ারম্যান-কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমার অসুখ-টসুখও বদলে গেছে। ডোন্ট ওরি। রিল্যাক্স—রিল্যাক্স—'

এই হাউসে আসার আগে আরও তিন চারটে বড় কোম্পানিতে কাজ করতে পার্ল। কিন্তু অশোকের মতো আর কারওকে কখনও দেখিনি। দু'চার জন ছাড়া বেশির ভাগ শিল্পপতিই ভয়ঙ্কর রকমের গুরুগম্ভীর। এমপ্লয়িদের পোকামাকড় মনে করেন। সবসময় নাক-উঁচু; কথা তো বলেনই না, যদিও বা দু'চারটে শব্দ তাঁদের মুখ থেকে বেরয়, মনে হয় অনেক, অনেক উঁচু লেভেল থেকে বলছেন।

অশোক আজ যা পার্লকে বলল, আগেও দু'একবার মজা করে করে এসব বলেছে। এক টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এমন অকপট, সরল, মজাদার মানুষ হতে পারে ভাবা যায় না। পার্ল তাকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

অশোক বলল, 'আজ আমার কী কী প্রোগ্রাম আছে?'

অফিসে রোজ কখন কাদের সঙ্গে মিটিং, কোন কোন ডকুমেন্টে সই করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ডায়েরিতে নোট করে রাখে পার্ল আর অফিসের বাইরের প্রোগ্রামগুলো রাহেজা মনে করিয়ে দেন। সেসব তাঁর ডায়েরিতে আগে থেকেই লিখে রাখেন।

পার্ল তার ডায়েরি দেখে বলল, 'আজ চারটে মিটিং আছে। ফরেন জার্নালিস্টদের একটা টিম আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে দুটোয়। আমাদের কোম্পানিগুলোর সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন যার প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ছাড়া আরও চারটে ছোট ইউনিয়নের নেতারা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, তারপর—'

তাকে শেষ করতে দিল না অশোক, 'ফরেন জার্নালিস্টরা ছাড়া অন্য ব্যাপারগুলো ততটা ইমপর্টান্ট নয়। প্লিজ এঁদের সবাইকে জানিয়ে দিন আজকের সব প্রোগ্রাম ক্যানসেলড।'

পার্ল এতটাই অবাক হল যে কিছুক্ষণ তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দও বেরুল না। সে লক্ষ করেছে এই হাউসে আসার পর থেকে প্রতিটি মিটিংয়ে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছে অশোক। ভীষণ পাংচুয়াল। সময়ের এতটুকু হেরফের কখনও হয়নি। এই প্রথম সে নিজেই আজকের প্রোগ্রামগুলো বাতিল করল।

পার্লের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল অশোক, 'হতভম্ব হয়ে গেছেন, তাই না? শরীর আমার ঠিকই আছে। তবে কেন যেন টায়ার্ড লাগছে। আজকের প্রোগ্রামগুলো কালকে ট্রান্সফার করে ওঁদের জানিয়ে দিন, আজ যে সময়ে যে মিটিং হওয়ার কথা, কাল ঠিক সেই সময়েই সেই মিটিং হবে। ওঁদের বলবেন, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা চেয়েছি।'

আস্তে মাথাটা কাত করল পার্ল। অশোক বলল, 'মিস্টার রাহেজাকে এখানে আসতে বলুন—'

চন্দ্রকান্ত চলে এলেন।

অশোক বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আমি এখন বাড়ি যাব।'

এ সময়ে কখনও অশোক বাড়ি যায় না, ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। অফিসের কাজকর্ম ছাড়াও বাইরের নানা প্রোগ্রাম থাকে, ক্লাবে যেতে হয়। পার্লের মতো রাহেজাও অবাক হলেন। কিন্তু কেন এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে, সে প্রশ্ন তো করা যায় না। পার্লের মতো রাহেজাও অবাক হলেন।

অশোক বলল, 'হার্ট আর প্রেশারের জন্যে হাই ডোজের ট্যাবলেট খেয়েছি, তাই ঘুম পাচ্ছে—'

রাহেজা ব্যস্ত হয়ে পড়েন, 'চলুন স্যর—'

লিফটে করে নীচে নেমে যায় লিমুজিনে উঠে পড়ল অশোকরা। গাড়িটা বাইরে বেরিয়ে খানিকটা এগুতেই বাধা পড়ল। তিরিশ-চল্লিশটি ফ্ল্যাটে চেহারার লোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে চেঁচাতে লাগল, 'থামো, থামো—'

শোফার গাড়ি থামিয়ে দিল। কর্কশ গলায় বলল, 'হটো—হটো—'

সরে যাবার লক্ষণই নেই। বরং চিৎকারের মাত্রাটা আরও অনেকটাই চড়িয়ে দিয়ে লিমুজিনের সামনের দিক আর দু'পাশ ঘিরে ফেলল।

অশোক বিরক্ত হচ্ছিল, 'কী চায় এরা? কেন গাড়িটা এভাবে আটকে হল্লা করছে? ব্যাপারটা দেখুন তো মিস্টার রাহেজা—'

রাহেজা জানলার কাচ নামিয়ে দিয়ে মুখ বাড়ালেন, 'কেন তোমরা এরকম অসভ্যতা করছ? রাস্তা ছাড়ো—'

একটা ঢ্যাঙা, রোগাটে চেহারার লোক হাত তুলে তার সঙ্গীদের থামিয়ে দিয়ে খোলা জানলার আরও কাছে চলে এল, তার পেছনে সাত-আটজন। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'নমস্কার স্যার, আপনাকে আমরা চিনি, অনেকবার আপনাকে দেখেছি।'

'তোমরা কারা?'

'আপনাদের জেনিথ স্টিল আর ইন্ডিয়া কেমিকেলের লেবার। সব লেবার অবিশ্যি আসেনি, আমরা ক'জন মাত্তর হেড অফিসের বাইরে সেই দুকুর থেকে দাঁড়িয়ে আছি—'

'কারখানা দুটো তো বজবজে। ডিউটি ফেলে এখানে এসে ঝামেলা করছ কেন?' রূঢ় গলায় বললেন রাহেজা।

হাতজোড় করে জড়সড় ভঙ্গিতে লোকটা ব্যাকসিটে অশোককে দেখিয়ে বলল, 'আমরা বড় সাহেবের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে চাই। শুনেচি ওনার খুব দয়াময়া—'

খেপে উঠলেন রাহেজা, 'রাস্তা আটকে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে! এত সাহস তোমাদের কোত্থেকে হয়? পুলিস ডাকব?'

অশোক চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'রাহেজা সাহেব, প্লিজ কুল ডাউন। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও দরকারে বজবজ থেকে এসে আমার জন্যে রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়েট করছে। কী বলতে চায় শোনাই যাক না। পুলিস ডাকার দরকার নেই।'

গাড়ি থামিয়ে ক'টা ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার, ময়লা জামাপ্যান্ট পরা, ভাঙাচোরা চেহারা, চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে, এই ধৃষ্টতা মেনে নিতে পারছিলেন না চন্দ্রকান্ত রাহেজা। পরক্ষণেই তাঁর খেয়াল হল, এতকাল যেসব ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে তিনি দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে অশোক ব্যানার্জিকে মেলানো যায় না। এ একেবারে অন্য ধাতুতে তৈরি। ঢোক গিলে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে স্যর, আপনি যা চাইছেন তাই হোক—' তিনি ব্যাকসিটের জানলার কাচ নামিয়ে

দিলেন।

ঢ্যাঙা লোকটা আর তার কয়েকজন সঙ্গী অশোকের দিকের জানলার কাছে চলে এল।

অশোক রাহেজার মনোভাবটা আঁচ করে নিতে পেরেছিল। অসংখ্য কোম্পানির সর্বেসর্বার পক্ষে রাস্তায় তাঁরই ফ্যাক্টরির ক'টা সামান্য ওয়ার্কারের সঙ্গে কথা বলাটা যে তাঁর আদৌ মনঃপূত হয়নি সেটা তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। রাহেজা তাঁর অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি যাতে ক্ষুণ্ণ না হন সে জন্য ঢ্যাঙা লোকটাকে বলল, 'আমার সঙ্গে যখন কথা বলা দরকার, রাস্তায় না দাঁড়িয়ে থেকে সোজা অফিসে চলে যাওয়া উচিত ছিল—'

হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে লোকটা বলল, 'বড় সাহেব, আমরা আপিসেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পাহারাওলারা আমাদের ঘাড় ধরে ধাক্কা মারতে মারতে খেদিয়ে দিয়েছে, এমনকী গেটের বাইরেও বসে থাকতে দেয়নি। লাঠি তুলে তাড়া করেচে। তাই দুরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।'

অশোক একটু চুপ করে থাকে। এদের প্রতি একটু সহানুভূতিই হয়। তারপর জিগ্যেস করে, 'অত দূর থেকে এখানে এসে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমাকে কী বলতে চান? দরকারটা কী?'

'বলতে সাহস হচ্ছে না।' হঠাৎ যেন দমে গেল লোকটা।

'সেই বজবজ থেকে বলার জন্যেই তো এসেছেন। ভয় নেই, বলুন—'

কিছুক্ষণ দোনোমনো করে লোকটা যেন হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল, 'বড় সাহেব, একদিন ক্রেপা করে আপনি যদি আমাদের কারখানায় আসেন—'

রাহেজা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। একটা তুচ্ছ শ্রমিক একশোরও বেশি কোম্পানির চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে কিনা রাস্তায় আটকে রেখে তাদের কারখানায় যেতে বলছে! চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠল তাঁর। অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়তে যাচ্ছিলেন, দাঁতে দাঁত চেপে সেটা বেরিয়ে আসতে দিলেন না।

অশোক অবাক, 'আপনাদের কারখানায় আমাকে যেতে বলছেন কেন?'

'কারখানায় গেলে আপনাকে কাছেই একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই—'

'তার মানে?'

'সেই জায়গাটেয় আমরা কী অবোস্থায় থাকি সেটা দেখাতে চাই—'

'অশোকের কৌতূহল হচ্ছিল। জিগ্যেস করল, 'কী অবস্থায়?'

'সেটা বুঝিয়ে বলার ক্ষ্যামতা আমার নেই। নিজের চোখে না দেখলে—' বাকটা শেষ না করে লোকটা চুপ করে গেল।

কী ভেবে অশোক বলল, 'ঠিক আছে, যাব। এবার রাস্তা ছেড়ে একপাশে সরে যান। আমাদের যেতে দিন।'

হাতজোড় করে নিঃশব্দে শ্রমিকরা সরে গেল। তাদের মুখচোখ দেখে মনে হয় এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের মাথায় যাঁরা বছরের পর বছর জাঁকিয়ে বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে নতুন-আসা এই যুবকটি আগাপাশতলা অন্যরকম। সহৃদয়, সহানুভূতিশীল।

গাড়ি ছলতে শুরু করেছিল। অশোক জিগ্যেস করল, 'মিস্টার রাহেজা আপনি তো পনেরো-ষোলো বছর এই হাউসে আছেন। এখানকার নাড়িনক্ষত্র সমস্ত আপনার জানা। ওই ফ্যাক্টরি ওয়ার্কাররা বা লবর মানে, কী অবস্থায় ওরা আছে, বলতে পারেন?'

রাহেজা সতর্ক হয়ে গেলেন। ওই শ্রমিকরা কীভাবে দিন কাটায় তিনি সবই জানেন। অশোককে তিনি শুধু পছন্দ নয়, যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করেন। কিন্তু এই হাউসে যে বাঘা বাঘা ডিরেক্টররা আছেন তাঁরা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান হাউসের ছোট-বড় এমন কিছু ইনফরমেশন রাহেজা অশোককে দিচ্ছেন যাতে এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের ক্ষতি হতে পারে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন।

অনেক সময় ঝুঁকি নিয়ে কিছু কিছু ইনফরমেশন যে অশোককে দেননি তা নয়, কিন্তু আজ চতুর কূটনীতিকদের মতো চাল দিলেন। ফ্যাক্টরি ওয়ার্কাররা যা বলেছে, সবটাই তাঁর জানা। কিন্তু অর্ধেক সত্যের সঙ্গে অর্ধেক মিথ্যে মিশিয়ে জানালেন, 'অনেকদিন আগে ওই কারখানা দুটোয় গিয়েছিলাম, দুর থেকে ওরা যেখানে থাকে সেই জায়গাটাও দেখেছি, তবে স্পষ্ট মনে পড়ছে না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অশোক বলল, 'নেক্সট চার-পাঁচ দিন সকালের দিকটা কয়েক ঘণ্টা ফাঁকা আছে?'

রাহেজা বললেন, 'যতদূর মনে পড়ছে নেই। কাল ডায়েরি দেখে বলতে পারব। তবে ফিফথ ডে'টা দুপুর একটা পর্যন্ত একেবারে ফ্রি। কোনও প্রোগ্রাম নেই।'

অশোক বলল, 'ওই সময় কারওকে কোনও টাইম দেবেন না।'

'আচ্ছা সার—'

লিমুজিন একসময় ওল্ড বালিগঞ্জে পৌঁছে গেল। অফিসে থাকতেই ক্লান্তিতে ঘুম পাচ্ছিল। রাস্তায় শ্রমিকদের সঙ্গে প্রচুর কথা বলতে হয়েছে।

অশোক পোশাক পাল্টে বিছানায় টান টান শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দু'চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এল।

॥ তিন ॥

কাল বিকেলে অফিস থেকে ফিরে অশোক শুয়ে এক দফা ঘুমিয়ে পড়েছিল, মাঝখানে একবার উঠে ডিনার সেরে ফের বিছানায়। ডিনারের গ্যাপটা বাদ দিলে বাকি লম্বা সময়টা একটানা ঘুমিয়ে অন্য দিনের মতো ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়ল সে।

ঘুমের মধ্যে আশ্চর্য একটা ব্যাপার আছে। সব ক্লান্তি সে হরণ করে নেয়। শরীর এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

ওল্ড বালিগঞ্জে প্রাসাদের মতো এই বাড়িতে সমস্ত কিছু ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যান্ত্রিক নিয়মে চলে। অশোকের ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বেড-টি এসে গেল। সেটা শেষ হতে না হতেই টানা তরুণীটির আবির্ভাব। তার সঙ্গে বাথরুমে ঢুকতে হল অশোককে। স্রেফ একটা জাঙিয়া পরে ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে পড়তে হল। নানারকম সুগন্ধি তরল তার গায়ে হালকা করে মাখিয়ে শুরু হল ম্যাসাজ। অশোককে কখনও চিত করে, কখনও উপুড় করে আগাপাশতলা ডলাই-মলাই চলতে লাগল।

একটি তরুণীর আঙুল সমস্ত শরীর জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রথম প্রথম ভীষণ অস্বস্তি হতো অশোকের। সেই সঙ্গে কেমন যেন শির শির করত। কিন্তু পরে আর সেরকম মনে হয় না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে আসার পর অন্য সব কিছুর মতো এটাও যান্ত্রিক হয়ে গেছে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট ম্যাসাজের পর স্নান। বাথরুম থেকে ফিরে পোশাক পাল্টে সোজা ডাইনিং হল-এ। ব্রেকফাস্টের পর ঘণ্টাখানেক খবরের কাগজ পড়া। তারপর প্রাইভেট সেক্রেটারি চন্দ্রকান্ত রাহেজার সঙ্গে ডালহৌসিতে তাদের হেড অফিসে।

বেয়ারারা সবে ব্রেকফাস্টের প্লেটগুলো সাজাতে শুরু করেছে, লীনা হইচই করতে করতে সেখে হাজির। সঙ্গে দারুণ স্মার্ট চেহারার একজন মাঝবয়সি পাক্কা সাহেব-সুবো টাইপের ভদ্রলোক।

অশোক ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু এই সকালবেলায় তাকে দেখে অবাক হল না। লীনা যখন-তখন এ বাড়িতে চলে আসে। বলল, 'গুড মর্নিং, তোমরা বোসো, বোসো। তোমার সঙ্গে যিনি এসেছেন তাঁকে তো চিনতে পারলাম না!'

লীনাও সুপ্রভাত জানিয়ে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি

মিস্টার উদ্ধব কার্লেকার, আর ইনি অশোক ব্যানার্জি। অশোক সম্পর্কে আপনি সবই জানেন। ইহ জন্ম ওয়ান অফ দা টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস অফ আওয়ার কান্ট্রি।'

অশোক কার্লেকারের দিকে তাকাল, 'বসুন মিস্টার কার্লেকার।' বেয়ারাদের বলল, 'এঁদের জন্যে রেফফাই নিয়ে এসো—'

লীনা এবং কার্লেকার একই সঙ্গে জানায় প্রাতরাশ সেরেই তারা এসেছে। কফি চলতে পারে। নাথিং এলস—

লীনারা বসে পড়েছিল। অশোকের ব্রেকফাই সাজানো হয়েছে। সে একটা বেয়ারাকে লীনাদের জন্য কফি আনতে বলল।

কফির মগে আলতো চুমুক দিয়ে লীনা বলল, 'তোমাকে তো সারা দিনে পাওয়া যায় না। হোল ডে অফিসে এক্সট্রিমলি বিজি থাকো। সন্ধের পর অবশ্য কোনও ক্লাবে দেখা মিলতে পারে কিন্তু সেখানে এত ক্রাউড যে আলাদাভাবে বসে কাজের কথা বলা যায় না। আর্জেন্ট কোনও ব্যাপারে তোমাকে ধরতে হলে আইদার তোমাদের বাড়িতে মর্নিংয়ে বা রাত এগারোটার পর আসতে হয়। রাত্তিরে টায়ার্ড থাকো, তাই সকালেই চলে এলাম।'

একটু হেসে অশোক জিগ্যেস করল, 'তোমার আর্জেন্ট ব্যাপারটা, এবার শোনা যাক।'

'কয়েকদিন আগে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। এর মধ্যেই ভুলে গেলে নাকি?'

লীনার সঙ্গে দেখা হলে নানা বিষয়ে কথা হয়। সে কোন টপিকটা সম্বন্ধে বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

লীনা তার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'স্ট্রেঞ্জ, মনে করতে পারছ না! সেদিন তোমাকে একটা সাজেশন দিয়েছিলাম, ইউরোপ আমেরিকায় গিয়ে সেই সব দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কশটা কীভাবে চালানো হচ্ছে সে ব্যাপারে একটা ধারণা নিয়ে এসো, সেই অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগবে। তুমি রাজি হয়েছিলে। তাই মিস্টার কার্লেকারকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছি।'

অশোক অবাক। — 'উনি কী করবেন?'

'ইউরোপ, আমেরিকায় যে যাবে, পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া তোমাকে কি সে সব কান্ট্রিতে ঢুকতে দেবে। মিস্টার কার্লেকার আউট দশদিনের ভেতর তোমার পাসপোর্টের ব্যাপারটা ঠিক করে দেবেন। ভিসার দিকটা আমি দেখব।'

অশোকের মনে পড়ে গেল। ইউরোপ, আমেরিকার কথা ক'দিন আগে হয়েছিল ঠিকই, সে রাজিও হয়েছিল। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেয়— যাবে না।

সে অর্থনীতির ছাত্র। এশিয়া বা আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন গরিব দেশগুলোর মানুষজনের কাছে ইউরোপ, আমেরিকা স্বপ্নের পৃথিবী। ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল অশোক। পরে ভেবে দেখেছে ইউরোপ বা আমেরিকার ইন্ডাস্ট্রি যে পদ্ধতিতে চালানো হয়, নতুন স্বাধীন একটা দেশে তা খাটবে না। সিদ্ধান্তটা তখনই খারিজ করে দেয় সে, কিন্তু লীনাকে তা জানাতে খেয়াল ছিল না।

লীনা একটু অধৈর্য হয়ে পড়ে, 'কী হল? অত কী ভাবছ?'

অশোক একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'সরি, আমার যাওয়া হবে না।'

প্লাক-করা ভুরু দুটো কুঁচকে যায় লীনার, 'কেন?'

'কারণ ওয়েস্টেজ অফ টাইম অ্যান্ড মানি।'

'কী বলছ তুমি!'

'ইউরোপ আর আমেরিকা, দুটো কন্টিনেন্টের নানা দেশে ঘুরে তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিশি, শিল্পের পরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকরা কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায়— এসব সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা করতে কত সময় লাগবে, ভেবে দেখো। তাছাড়া এত ঘোরাঘুরিতে কত লক্ষ টাকা খরচ হবে, নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে তোমার আইডিয়া আছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার এত ওয়েস্টেজ অ্যাবসোলিউটলি অননেসেসারি।'

হতভম্বের মতো তাকায় লীনা, 'কী বলতে চাইছ তুমি! ইউরোপ, আমেরিকা গিয়ে ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে যে এক্সপিরিয়েন্স, যে নলেজ তোমার হবে সেসব কোনও কাজে লাগবে না?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'কারণ?'

'কারণ আমেরিকা আর ইউরোপের কান্ট্রিগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইলি ডেভলপড। দু'শো বছরেরও আগে থেকে ওদের শিল্পের বিকাশ ঘটে চলেছে। আর্থিক ভিত ওদের কত স্ট্রং। আর আমরা?'

'আমরা কী?'

'এই সেদিনও ইন্ডিয়া ছিল ব্রিটিশ কলোনি। মাত্র কয়েক বছর হল দেশটা স্বাধীন হয়েছে। ইংরেজরা যখন ছিল, নিজেদের স্বার্থে বড় বড় ক'টা শহরের চারপাশে কিছু কলকারখানা বসিয়েছিল। জুট, টেক্সটাইল, ট্যানারি এটসেটরা, এটসেটরা। কিন্তু সে আর ক'টা! আমাদের দেশকে শুষে নিয়ে শুকনো খোলস ফেলে রেখে ওরা চলে গেছে। তার ওপর ইন্ডিয়ায় এত পপুলেশন। এই অবস্থা থেকে উঠে আসতে যথেষ্ট সময় লাগবে। বেসিক্যালি ইন্ডিয়া আগ্রারিয়ান কান্ট্রি, রাতারাতি তাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া বানিয়ে ফেলব, তাই কখনও হয়! দু'টো পাঁচ-সালা, মানে ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান পার হয়ে গেছে। বেশ কিছু নতুন কলকারখানা যে হয়নি তা নয়। আমাদের দেশকে হানড্রেড পারসেন্ট আন্ডার-ডেভলপড কান্ট্রি হয়তো বলা যাবে না, মেরেকেটে ডেভলপিং বলা যায়। আমরা উন্নয়নের দিকে সবে পা ফেলতে শুরু করেছি। একটা কথা মনে রেখো—'

এই সকালবেলায় অশোকের এই সব শুকনো কচকচানি ভালো লাগছিল না লীনার। ঝাঁঝালো গলায় সে বলল, 'কী মনে রাখব?'

'ইউরোপ, আমেরিকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিশি এদেশে চলবে না। বিদেশের গাছের চারা এনে ইন্ডিয়ার মাটিতে পুঁতে দিলে আর সেগুলো ডালপালা ছড়িয়ে থোকায় থোকায় ফুল ফুটিয়ে দিল, এমন সব ভুল স্বপ্ন দেখার—'

গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দিল লীনা, 'তোমার এই ভাষণ থামাও তো—'

স্যর হরিকিষণ দেশাইয়ের মেয়ে আগে এভাবে কখনও কথা বলেনি। অশোক থতমত খেয়ে গেল।

লীনার স্বর লহমায় স্বাভাবিক হল, 'সেদিন আমরা পারমিতা আন্টির 'নবজীবন প্রকল্প'-এ গিয়েছিলাম, মনে আছে?'

পারমিতা আন্টি মানে শিল্পপতি সোমদেব চ্যাটার্জির স্ত্রী। এই সোমদেবই তাঁদের বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে অশোককে এনে তাঁরই সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন। অশোকের চ্যালেঞ্জ হল বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা হতে পারলে প্রচুর বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সামাজিক পাটার্ন কিছুটা হলেও বদলে দিতে পারবে। শুধু তাই নয়, অন্য শিল্পপতিদেরও এই উদ্যোগে তার সঙ্গে হাত মেলাতে বলবে। এতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে বলেই তার বিশ্বাস।

সোমদেবের মতো দেশের একজন টপমোস্ট শিল্পপতির স্ত্রী হয়েও বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় পারমিতা জীবন সঁপে দিয়েছেন। বেলেঘাটার বিশাল বস্তি জুড়ে তাঁর 'নবজীবন প্রকল্প'র কাজ চলছে কয়েক বছর ধরে। বস্তিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ছোট ছোট হ্যান্ডিক্রাফটের কারখানা বসিয়ে তাদের কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করা— এসব নিয়েই মেতে আছেন। মাঝে মাঝে জমকালো অনুষ্ঠান করে শহরের গণ্যমান্য মানুষ এবং বিদেশি কনসুলেটগুলোর কর্তা এবং দেশ-বিদেশের মিডিয়ার লোকদের ডাকেন। ঢাকঢোল বাজিয়ে পারমিতা চ্যাটার্জির জনসেবার প্রচার চলে। এই প্রকল্পে ইন্ডিয়ার তো বটেই বিদেশের গভর্নমেন্ট, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস থেকে প্রচুর ডোনেশন বা গ্রান্ট আসে।

কয়েকদিন আগে বেলেঘাটায় গিয়ে 'নবজীবন প্রকল্প'র কর্মকাণ্ড দেখে এসেছে অশোক। লীনাও সেখানে গিয়েছিল।

লীনা বলল, 'তুমি তো জানো সেদিনই আমি প্রথম কোনও

ন্নামে যাই। আর ওই একদিনের এক্সপিরিয়েন্স এলাবোরেটলি লিখে আমেরিকার একটা হাইস্কুলে স্যার্কুলেটেড পেপারে পাঠিয়ে দিই। তাতে কাজ হয়েছে। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা মানে যেগুলো একসময় ব্রিটিশ কলোনি ছিল সেই সব দেশ থেকে আমেরিকার একটা এক্সপার্ট কমিটি পনেরো জনকে বেছে নিয়েছে। এই টিমে আমিও আছি। আমাদের এই সাব-কন্টিনেন্টের ক্লাম-ডোয়েলার আর ব্যাকওয়ার্ড পিপল কীভাবে বেঁচে আছে, কেমন ভাদের লাইফ, যেখানে থাকে সেখানকার পরিবেশ কেমন—এসব নিয়ে আমাকে সেমিনারে বলতে হবে। এই ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন চাই—'

অশোক হতবাক। এই মেয়েটা সেদিন 'নবজীবন প্রকল্প'র কাজ দেখতে যাওয়া ছাড়া কোনও বস্তির ধারেকাছে ঘেঁষেনি। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জীবনের বেশির ভাগটাই তার কেটেছে বিদেশে। চোখ ধাঁধানো তার লাইফ স্টাইল। সে কিনা বইশত্র পড়ে, নানা পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে প্রচুর স্ট্যাটিসটিক্স জোগাড় করে ইন্ডিয়ার সব থেকে পিছিয়ে থাকা, আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে নীচু স্তরের মানুষদের ওপর থিসিস লিখে আমেরিকার থেকেই ডক্টরেট করে এসেছে। এখন চলেছে এদের সম্বন্ধেই একটা সেমিনারে যোগ দিতে। সাতটি আশ্চর্যের কথা শোনা যায়। স্যর হরিকিষণ দেশাইয়ের মেয়েটি খুব সম্ভব অষ্টম আশ্চর্য।

অশোক বলল, 'ইনফরমেশন যত চাও পাবে—'

'এবার তাহলে পাসপোর্টের ব্যাপারটা—'

লীনাকে শেষ করতে দিল না অশোক, 'তোমাকে স্পষ্ট করে বলেছি, আমি বিদেশে যাচ্ছি না। কেন যাব না তাও বুঝিয়ে দিয়েছি। এই হাউসে আমি একটা মিশন নিয়ে এসেছি। সেটা ছাড়া অন্য দিকে তাকানোর সময় আমার নেই—'

'মিশন!' ভুরু দুটো অনেকটা উঁচুতে তুলল লীনা, 'প্যালেসের মতো এয়ার-কন্ডিশনড বিল্ডিংয়ে থাকছ, ডজনখানেক বেয়ারা বাবুর্চি তোমাকে সার্ভিস দেবার জন্যে সব সময় ব্যাটেশনসের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, ইয়াং চীনা মেয়েটা তোমাকে হাফ-নেকেড, নাকি ফুল নেকেড করে তার মাখনের মতো আঙুলগুলো দিয়ে ম্যাসাজ করে। বন্ধ বাথরুমে আর কী কী হয়, গড ওনলি নোজ। এয়ার-কন্ডিশনড লিমুজিন ছাড়া অন্য গাড়িতে চড়ো না। তোমাদের অফিস বিল্ডিংটা সেন্ট্রালি এয়ার-কন্ডিশনড। সন্ধের পর দামি দামি ক্লাবে যাচ্ছ। শুধু আরাম, আরাম আর আরাম আর লাক্সারি। এর মধ্যে তোমার মিশনের দিকে ক'টা স্টেপ এগতে পেরেছ? আস্ত ইওরসেলফ।'

অশোক চমকে ওঠে। এটা ঠিক, যে পাখির চোখ সামনে রেখে তার এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে আসা সেসবের প্রায় কিছুই এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি সে। বলল, 'নিজেকে কী জিগ্যেস করব? নিজের কাছে আমি ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট অনেস্ট। সোমদেব চ্যাটার্জি বলেছিলেন, তাঁদের হাউসের টপমোস্ট জায়গায় বসতে হলে লাইফ স্টাইলটা বদলে ফেলতে হবে। তাই এত বড় বিল্ডিংয়ে থাকা, লিমুজিনে চড়া, ক্লাবে যাওয়া, এটসেটরা এটসেটরা—'

লীনার ঠোঁটে কৌতুকের একটু হাসি ফুটে ওঠে, 'অশোক, যে যা করে বা করতে বাধ্য হয়, নিজের মতো করে তার রিজন খাড়া করে। চুরি করে কেউ ধরা পড়লে সাফাই গায়, 'বউ বাচ্চা নিয়ে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছিলাম তাই চুরিটা করে ফেলেছি জাঁহাপনা।' অশোক, আমি কিছু কিছু ব্যাপার ফোর্স করতে পারি। কী দেখছি জানো, আর করকে মাস এভাবে কাটালে কমফোর্ট আর লাক্সারি তোমাকে গিলে ফেলবে।'

ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে অশোকের। বেশ জোর দিয়েই বলে, 'নিজের ক্লাস-ক্যারেক্টার আমি এক মোমেন্টের জন্যেও ভুলে যাই না লীনা। আমার রুটটা রয়েছে বস্তিতে। বাইরে কোট-প্যান্টের খোলস থাকলেও আমি একজন ক্লাম-ডোয়েলার—বস্তিবাসী। যে পারপাসে আমার এখানে আসা, সেটা হয়ে গেলেই আমার রুটে মাঝে টিলিগঞ্জের সেই বস্তিতে ফিরে যাব।'

পরিবেশটা থমথমে হয়ে উঠেছিল। গুমোট ভাবটা কাটানোর জন্য লীনা হাসিমুখে হাত নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমি যা বলেছি সিম্পল ফান। অত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন?'

অশোক উত্তর দিল না।

লীনা বলতে লাগল, 'দেশের অলমোস্ট সব ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টই ফরেনে যায়। কেউ কেউ যায় বিদেশের নামকরা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কোলাবরেশনে ইন্ডিয়ায় কলকারখানা বসানো নিয়ে কথাবার্তা বলা, ওখানকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলো একটু-আধটু দেখা, কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, বিদেশ থেকে নিজেদের কোম্পানিগুলোর জন্যে ইনভেস্টমেন্ট আনার নাম করে ইউরোপ, আমেরিকায় ঘুরে বেড়ানো। জাস্ট ফর এনজয়িং লাইফ—'

অশোক এবারও চুপ।

লীনা থামেনি, 'তোমার হাতে বিরাট সুযোগ এসে গেছে অশোক। অন্য অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মতো তুমিও তোমাদের হাউসের স্বার্থের কথা বলে বেরিয়ে পড়বে। তোমার বয়স হার্ডলি পঁচিশ কি ছাব্বিশ। এটাই তো এনজয় করার পারফেক্ট এজ। যু উইল ডেফিনিটলি গো অ্যান্ড এনজয়—'

'তোমাকে তো বলেছি যাব না। কেন জোর করছ?'

'যাবে, যাবে। আমার সেমিনার নেক্সট মান্থের এন্ডে। আমার সঙ্গেই তুমি আমেরিকার ফ্রাইটে উড়বে। সেখান থেকে ইউরোপের নানা কান্ট্রি— জার্মানি, ইতালি, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এমনি আরও আরও অনেক কান্ট্রি। সব একেকটা ড্রিমল্যান্ড—'

লীনা যেসব দেশের নাম করল, বই-টই পড়ে এবং হলিউড আর এমজিএম-এর বিস্ময়কর সব ছবি দেখে, অবশ্য নিজের পয়সায় নয়, রেখার ঘাড় ভেঙে, সেই দেশগুলো সম্পর্কে তার মোটামুটি একটা ধারণা আছে। সত্যিই মোহময় ড্রিমল্যান্ড। তীব্র একটা প্রলোভন সেই দেশগুলোর দিকে যেন তাকে টানতে লাগল। দু-চার লহমা মাত্র। তারপরেই লোভটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল অশোক। জানিয়ে দিল যা সে ঠিক করেছে তার নড়চড় হবে না। নিজের লক্ষ্য থেকে তার দৃষ্টি অন্য কোনও দিকে সরে যাবে না, তা সে আমেরিকা কি ইউরোপ হোক বা সৌরলোকের অন্য কোনও গ্রহ।

চোখ সরু করে অশোকের দিকে তাকিয়ে ছিল লীনা। বলল, 'আজকে তোমার মুডটা ঠিকঠাক নেই। তিন-চারদিন বাদে মিস্টার কার্লেকারকে নিয়ে আমি ফের আসছি। সেদিন পাসপোর্টের ব্যাপারটা ফাইনাল করে যাব। অ্যান্ড বোথ অফ আস উড স্লাই টুওয়ার্ড আমেরিকা। এনজয় লাইফ, এনজয়। বাই—' কার্লেকারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল সে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ আগেই। এতক্ষণে তার অফিসে চলে যাবার কথা। কিন্তু অন্যমনস্কর মতো ডাইনিং টেবিলেই বসে আছে অশোক।

বিশাল এই খাওয়ার ঘরে এখন অন্য কেউ নেই। কয়েকটা বেয়ারা বাইরের লাউঞ্জে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বড়সাহেব যদি কোনও হুকুম দেন, তামিল করতে হবে তো।

নির্জন ফাঁকা ঘরে বসে থাকতে থাকতে নানা দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কত চিন্তা যে তার মাথায় ঢুকে যাচ্ছে! লীনা যা বলে গেল তার সবটাই কি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার মতো?' শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই বিলাসবহুল প্রাসাদে থাকা, পঁচিশ-তলা অফিস বিল্ডিংয়ের সর্বেসর্বা হয়ে যাওয়া, চীনা তরুণীর ম্যাসাজ, সন্ধেবেলায় ক্লাবে গিয়ে সোসাইটির সবচেয়ে উঁচু লেভেলের কোটি কোটিপতিদের গায়ে গা ঘেঁষে সময় কাটানো, দু-এক পেগ বিদেশি মদ্যপান— অজস্র আরাম আর বিলাস তার ভালো লাগছে না? একটা টালির চালের বস্তির ছেলে ক্রমশ এসবের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে না? কেউ যদি এই দিকটায় আঙুল তুলে বলে, তুমি তো সোশ্যাল প্যাটার্ন বদলে দেবার জন্য এসেছিলে, কিন্তু

নিজেই রাতারাতি এত বদলে যাচ্ছ কেন? আত্মরক্ষার জন্য ঢাল আর জোরালো যুক্তি তৈরি করাই আছে। একটা বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে সে এখানে এসেছে। তাই এখানকার লাইফস্টাইল তাকে মেনে নিতে হয়েছে।

পরক্ষণে মনে পড়ল, লীনা, শুধু লীনা নয়, আরও অনেকে তার কাছে জানতে চেয়েছে সাড়ে তিন মাস তো সে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে এসেছে, তার উদ্দেশ্য পূরণ কতটা হল? এর উত্তর— মস্ত একটা শূন্য। সামগ্রিকভাবে অফিসে কম্পিউটার বসানো বন্ধ করে দিতে পেরে তার বেশ গর্বই হয়েছিল, কিন্তু পরে জানতে পেরেছে এতে তার কোনও কৃতিত্ব নেই, সোমদেব চ্যাটার্জিই আড়ালে থেকে কৌশলে এই কাজটা করেছেন এবং তা শ্রমিকদের কথা ভেবে নয়, তাঁদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের স্বার্থে।

সমাপতনই বলা যায়, নাকি কাকতালীয়, সোমদেবের কথা অশোক যখন ভাবছে ঠিক তখনই তাঁর ফোন এল। — 'গুড মর্নিং—'

অশোক ফোনটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বেশ অবাকই হল। তারপর 'সুপ্রভাত' জানিয়ে বলল, 'আমাকে আপনার জায়গায় বসিয়ে দূরে সরে গেছেন। আমি এখানে আসার পর যতটা মনে পড়ছে তিন-চারবারের বেশি আমাকে ফোন করেননি। হঠাৎ আজ আমার কথা মনে পড়ল যে?'

'যে লক্ষ্য নিয়ে তুমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে এসেছ তার কতটা কী করতে পারলে হঠাৎই তা জানতে ইচ্ছে হল, তাই—'

মেজাজটা তপ্ত হয়ে উঠল অশোকের। নিজের সাজপোশাক তার গায়ে চড়িয়ে বিরাট রণক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়ে তিনি যে আড়াল থেকে প্রতিটি মুহূর্ত তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন তা কি আর টের পায় না অশোক?

মাথা থেকে যতটা সম্ভব উত্তাপ বের করে দিয়ে নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করল অশোক, 'আমার ধারণা আপনি সবই জানেন—'

'আমি কী জানি, কতটা জানি সেসব থাক। যতদূর মনে করতে পারছি, তিন মাস দু'উইক হল আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে এসেছ। এর মধ্যে তোমার অ্যাচিভমেন্টটা কী, সমাজ বদলে দেবার জন্যে কোন কোন স্টেপ নিয়েছ সেসব তোমার মুখেই শুনতে চাই।'

অস্বস্তি বোধ করতে থাকে অশোক। বলে, 'প্রায় কিছুই করতে পারিনি।'

কণ্ঠস্বরে মজা বা কৌতুক মিলিয়ে সোমদেব বললেন, 'আশ্চর্য, য়ু আর আ রেভোলিউশনারি। তিন মাস দু'সপ্তাহ মানে একশো পাঁচদিন হাতে পেয়েও কিছু করা গেল না? কেন?'

'তার কারণ আপনাদের সিস্টেমা'

'সিস্টেমটা ভেঙে নিজের মিশন সাকসেসফুল করার জন্যেই তো এখানে এসেছিলে, তাই না?'

অশোক টের পাচ্ছে তাকে ঠেলতে ঠেলতে সোমদেব চ্যাটার্জি অদৃশ্য, অতল কোনও খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তার অস্বস্তিটা বাড়তে থাকে। সোমদেবের প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।' দেখা করার ভাবনাটা অনেক আগেই তার মাথায় এসেছিল। অযাচিতভাবে সুযোগটা এসে গেছে।

সোমদেব বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম; আজ কিনা তুমিই আমার দর্শনপ্রার্থী! ওকে, তুমি যখন বলছ তাই হবে। তবে—'

'তবে কী?'

'আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ার তোমার হাতে তুলে দিয়ে আসার পর একরকম বেকারই হয়ে গেছি। তবু কিছু কিছু কাজ আমাকে করতে হয়, বাইরে বেরুতেও হয়। তাই আগে একটা ফোন করে এসো। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই ফোন করব। আপনার বেশি সময় নেব না। ম্যাক্সিমাম এক ঘণ্টা—'

'এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা— যতক্ষণ ইচ্ছে আমার সঙ্গে গল্প-টল্প করতে পার। কিন্তু একটা শর্ত আছে—'

'কীসের শর্ত?' খুব অবাকই হল অশোক।

সোমদেব হালকা গলায় বললেন, 'যে কোনও টপিক, যেমন ধর্ম, রাজনীতি, দেশভ্রমণ, স্পোর্টস— এসব নিয়ে আমরা গল্প করব, তর্ক-বিতর্কও হবে। কিন্তু এই লিস্ট থেকে ইন্ডাস্ট্রি আর তোমার মিশন আর চ্যালেঞ্জ, এই দুটো বাদ। কেন জানো?'

বিরাট এই শিল্পপতির মস্তিষ্টি ছুরির মতো ধারালো। তিনি কী ইঙ্গিত দিয়েছেন, মোটামুটি ধরতে পেরেছে অশোক। সে উত্তর দিল না।

সোমদেব বলেই চলেছেন, 'একটু আগে বললে না, আমাদের হাউসের সিস্টেমের জন্যে তোমার স্বপ্নই বলো আর উদ্দেশ্যই বলো তা পূরণ করতে পারছ না। এই সিস্টেমটাই তোমাকে বাধা দিচ্ছে—'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'এই বাধাটা কীভাবে সরানো যায় খুব সম্ভব সে ব্যাপারে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে অ্যাডভাইস চাইবে।'

অশোক চমকে উঠল। সোমদেব চ্যাটার্জি হয়তো একজন তুখোড় খট-রিডার। কথায় কথায় কৌশলে জগদ্দল পাথরের মতো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমকে কীভাবে ভাঙা যায় তার একটা হদিশ পাওয়ার জন্যই তাঁর সঙ্গে যে সে দেখা করতে চাইছে, তিনি তা ঠিক ধরে ফেলেছেন। খুব বিব্রত হয়ে পড়ে অশোক। লহমায় সামলে নিয়ে বলল, 'না, না, তেমন কিছু নয়। অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই ভাবলাম আপনি সময় দিলে একটু গল্পটল্প করে আসব। সোমদেব চ্যাটার্জি দেশের একজন জয়েন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, ইকনমিকসে মহা মহা পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু শেখা যায়। তাই—'

অন্য প্রান্ত থেকে হালকা হাসির আওয়াজ ভেসে এল। সেই সঙ্গে সোমদেবের কণ্ঠস্বর, 'তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতেই পারে; আমার শর্ত মেনে দেদার গল্প-টল্পও হতে পারে কিন্তু—'

অশোক উদগ্রীব হয়েই ছিল। জিগ্যেস করল, 'কিন্তু কী?'

'অশোক, সোসাইটির যে লেভেলে আমি আছি আর বস্তির যে লেভেল থেকে তুমি এসেছ, তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও এক নয়, তুমি দক্ষিণ মেরু হলে আমি উত্তর মেরু। কোনও দিক থেকেই এক বিন্দু মিল নেই। তুমি সমাজকে বদলে দেবার জেদ বা মিশন নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে এসেছ। ইন ফ্যাক্ট ঢুকে পড়েছ একটা চক্রব্যূহে। সেটা ভেঙে তোমার কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সোমদেবই ফের শুরু করেন, 'অশোক, আমি পা থেকে মাথা অবধি ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্ল্ডের লোক। আমি স্বাভাবিকভাবেই আমার শ্রেণীস্বার্থ দেখব। তোমাকে শিল্পপতি বানানো হলেও তুমি সোসাইটির একেবারে নীচের স্তরের একজন রিপ্রেজেনটেটিভ। সেদিক থেকে আমরা একজন আরেকজনের প্রতিপক্ষ। তুমি একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখানে এসেছ। এমনকী যুদ্ধে নেমেও পড়েছ। আমি কিন্তু রণক্ষেত্রের বাইরে। তোমার বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তুলব না, আবার তোমার পক্ষেও দাঁড়াব না। আমি আগেও জানিয়েছি, আবারও বলছি, রণক্ষেত্রের বাইরে আমি একজন দর্শকমাত্র। ইজ ইট ক্লিয়ার?'

নিজের মনেই অশোক বলল, ক্লিয়ার তো বটেই। যে যুদ্ধে সে নেমেছে সেখানে সে নিজেই ফিল্ড মার্শাল এবং যোদ্ধা। ওয়ান-ম্যান আর্মিই বলা যায়।

সোমদেবের গলা আবার শোনা গেল, 'আমার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সেটা করা ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারছি না। ইন ফ্যাক্ট কীভাবে নেবে তাই নিয়ে আমার হেজিটেশন আছে। কারণ প্রশ্নটা খুব প্লেজান্ট নয়।'

স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গেল অশোকের। কী প্রশ্ন করতে পারেন সোমদেব? একটু নার্ভাস লাগছে কি? কিন্তু সে শক্ত ধাতুতে তৈরি, সহজে ঘাবড়ায় না! নিজেকে মুহূর্তে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'যা বলতে চাইছেন প্লিজ বলুন। নো হেজিটেশন—'

'আমার প্রশ্নটা হল সোশ্যাল প্যাটার্ন বদলে দেবার যে অ্যামেজিং এক্সপেরিমেন্ট করতে এসেছ, কাজে নেমে কি মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব নয়? কখনও কখনও কী ভাবো সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাই?'

'হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন?' অশোকের গলার স্বরটা তীক্ষ্ণ শোনায়।

সোমদেব বললেন, 'হঠাৎই প্রশ্নটা মাথায় এসেছে, তাই। উত্তর যদি দিতে না চাও, দিও না। ইগনোর করতে পার।'

আচমকা কাল বিকেলের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল অশোকের। তাদেরই দু'টো কোম্পানির জেনিথ স্টিল আর ইন্ডিয়া কেমিক্যালের তিরিশ-চল্লিশজন ভাঙাচোরা, ক্ষয়াটে চেহারার লেবার তার গাড়ি থামিয়ে হাতজোড় করে বারবার কাকুতি-মিনতি করেছিল, তারা কী অবস্থায় আছে তা যেন স্বচক্ষে দেখে আসে সে। সাড়ে তিন মাস একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্পায়ারে কাটিয়ে দিয়েছে কিন্তু তেমন কিছুই করে উঠতে পারেনি। কাল অশোক ওই শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়েছিল, অবশ্যই দেখতে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ কেন যেন মনে হল ওই লেবারারগুলোকে দিয়েই তার আসল যুদ্ধযাত্রা শুরু হবে।

অশোকের সমস্ত স্নায়ু চনমনে হয়ে ওঠে, 'প্রশ্ন যখন করেছেন, উত্তর অবশ্যই দেব। অনেক ব্যাপারে আমি সিনিক হতে পারি কিন্তু লড়াই করতে নেমে ডিফিক্টিস্টদের মতো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাই না। যে পারপাসে আপনাদের এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্পায়ারে আসা তার শেষ না দেখে ছাড়ব না।'

'ফাইন।' তারিফের সুরে সোমদেব বললেন, 'দিস শুড বি দা প্সিরিট। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইট। ক্যারি অন—'

'ধন্যবাদ—'

'অনেকক্ষণ আমরা কথা বলেছি। আর তোমাকে আটকে রাখা ঠিক হবে না। অফিসে যাবার সময় হয়েছে। শুধু ছোট্ট একটা খবর জানতে চাইছি—'

'কী খবর?'

'লীনা সেদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল। বলল, সে তোমাকে ইউরোপ-আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায়। ওই দুই কন্টিনেন্ট—'

সোমদেবের কথার মধ্যেই অশোক বলে ওঠে, 'কিছুক্ষণ আগে সে আমার এখানে এসে একই কথা বলেছে। আমি স্রেফ 'না' বলে দিয়েছি।'

সোমদেব বললেন, 'ফরেনে একবার ঘুরে এলেই পারতে। যে এক্সপিরিয়েন্স হতো তা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কাজে লাগত। সব এক্সপেন্সেস আমাদের হাউসের।'

লীনা আরও আনেক টপিকের সঙ্গে এটাও বলেছে। বিদেশ ভ্রমণের প্রলোভনটা টোপের মতো নাকের সামনে ঝুলিয়ে সোমদেব কি তাকে বাজিয়ে দেখতে চাইছেন? বিদ্যুৎ চমকের মতো অন্য একটা সম্ভাবনা অশোকের মাথায় খেলে গেল। সোমদেবের হয়তো ধারণা, কয়েক মাস স্যর হরকিশণ দেশাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এলে টালির চালের বস্তিবাসী মহা, মহা বিপ্লবী যুবকটির সমাজ বদলে দেবার স্বপ্ন এবং যুদ্ধের যাবতীয় পরিকল্পনা বাষ্প হয়ে উবে যাবে।

অশোকের মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনাকে যা বললাম, লীনাকেও ঠিক তাই বলেছি। নিজের দেশ ছেড়ে আমেরিকা-ইউরোপ কেন, সোলার সিস্টেমের অন্য কোনও প্ল্যানেটেও আমার যাবার ইচ্ছে নেই। যে চাপেটি নিয়ে আপনাদের হাউসে এসেছি সেটা থেকে সিকি সেন্টিমিটারও কেউ আমাকে সরাতে পারবে না। ন'টা বেজে গেছে। এবার কি আমি অফিসে যেতে পারি?'

'শিওর, শিওর—'

ফোন বন্ধ করে উঠে পড়ল অশোক। চোখে পড়ল ডাইনিং রুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার রাহেজা। সেদিকে এগিয়ে যায় সে।

॥ চার ॥

সেই যে সেদিন জেনিথ স্টিল আর ইন্ডিয়া কেমিক্যালের লেবাররা রাস্তায় অশোকের গাড়ি ঘেরাও করেছিল তারপর তিনটে দিন কেটে গেছে। এই হাউসে আসার পর প্রতিটি দিন সকাল থেকে রাত সাড়ে ন'টা-দশটা অবধি একই রুটিন মেনে তাকে চলতে হয়। যান্ত্রিক, গতানুগতিক, নানা কর্মসূচিতে ঠাসা দিনগুলো যেন একটা অন্যটার হুবহু কার্বন কপি।

মিস্টার রাহেজা জানিয়েছেন, আর একটা দিন একই রুটিনে কেটে গেলে পঞ্চম দিনটা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অশোকের জন্য কোনও কর্মসূচি নেই। বিশাল শিল্প সাম্রাজ্যের চূড়ায় বসার পর সাড়ে তিন মাসে এই প্রথম একটা দিনের আনেকটা সময় অশোক একেবারে মুক্তপুরুষ। নিজের মর্জিমতো এই সময়টা সে কাটাতে পারে।

অশোক পঞ্চম দিনটার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সে ঠিকই করে আছে ওই দিন সকালেই বজবজে চলে যাবে। চীনা তরুণীটিকে সেদিন আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বজবজে কতক্ষণ তাকে থাকতে হবে, ধারণা নেই, তাই অফিসকে জানিয়ে দিয়েছে ওই দিনটা সে পুরোপুরি ছুটি নিচ্ছে, বিকেলের দিকে যেসব কনফারেন্স বা মিটিং-টিটিং আছে সেগুলো সুবিধামতো অন্য একদিন করা হবে।

আজ চতুর্থ দিন। একটা কনফারেন্স সেরে এইমাত্র নিজের চেম্বারে ফিরে এসে বসে পড়ল অশোক। সামনের দিকের ওয়াল ক্লকটায় এখন তিনটে বেজে সাইত্রিশ। আজ আর তেমন কোনও

কাজ নেই। জরুরি ব্যাপারগুলো মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। কয়েকটা ডকুমেন্টে সই করা। শুধু বাকি।

এখানে আসার পর কয়েকটা বদভ্যাস তার হাড়ে-মজ্জায় ঢুকে গেছে। টালিগঞ্জের বস্তিতে থাকতে চা'টা একটু বেশিই খেত। সে যে কী চা, কহতব্য নয়। তিতকুটে, বিস্বাদ সেই তরল বস্তুটির থেকে ঘোড়ার পেচ্ছাবও অনেক ভালো। কিন্তু এই অফিসে সবচেয়ে দামি, মনমাতানো সুগন্ধ, আর সুস্বাদু কফি দেওয়া হয়। তার সঙ্গে কাজু, আখরোট, পেস্তা, কিসমিস এবং নানা ধরনের কুকিস।

মিস্টার রাহেজা হাউসের সর্বময় অধীশ্বরের কফি প্রীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনি বেয়ারাদের জানিয়ে দিয়েছেন, দু'ঘণ্টা পরপর বড়সাহেবের চেম্বারে যেন কফি নিয়ে আসা হয়।

কফি এসে গিয়েছিল। হালকা চুমুক দিতে দিতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে অশোক। সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা পর্যন্ত সে অফিসে থাকে, তারপর রাহেজা তাকে ক্লাবে নিয়ে যান।

অশোক মনস্থির করে ফেলল আজ আর ক্লাবে যাবে না; সোজা চলে যাবে ওল্ড বালিগঞ্জে। কাল সকালেই তার গন্তব্য বজবজ। একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাম্রাজ্যের চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বয়ং সামান্য বেয়ারাদের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন এই খবরটা গোপন থাকবে না। হেড অফিসে তার বিরাট প্রতিক্রিয়া যে হবে, তা আদ্দাজ করতে পারছিল অশোক কিন্তু সেটা কতটা তীব্র, কতটা মারাত্মক বোঝা যাচ্ছে না। শুধু কি তাদের অফিসেই, অন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসগুলোও জেনে যাবে। তাছাড়া মিডিয়া কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে? তারাও ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মন শক্ত করে নেন অশোক। যা হবার হোক, সে কাল বজবজ যাচ্ছেই। শিঙ্গজগতে আলোড়ন অবশ্য উঠবে, উঠুক। সেটাই তো সে চায়। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা হচ্ছে।

এরই মধ্যে তিন-চারটে ডিপার্টমেন্টের টপ একজিকিউটিভরা এসে নানা কাগজপত্রে তাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে গেলেন।

চিন্তাটা চলছে, সেই সঙ্গে উত্তেজনার মাত্রাও। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

অশোকের টেবিলে চার-পাঁচটা ফোন রয়েছে। এগুলো তার নিজস্ব। এই হাউসের অজস্র কোম্পানির ডিরেক্টর আর টপ এগ্জিকিউটিভ ছাড়া সরাসরি তাকে অন্য কেউ ফোন করে না। অবশ্য কলকাতা এবং দেশের নানা শহরের বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কথা আলাদা। তাঁরা প্রয়োজন হলে এই ফোনগুলোতেই কথা বলেন। এঁরা ছাড়া এই চার-পাঁচটা ফোনের নম্বর অন্য কারওকে দেওয়া হয়নি।

এই তালিকার বাইরের আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তাকে ফোন করতে হয় রিসেপশনে। সেখান থেকে সেট আসে পার্লের কাছে। যে ফোন করেছে তার নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে অশোককে জানায়। অশোক চাইলে তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় পার্লা। না চাইলে 'সরি' বলে লাইন কেটে দেওয়া হয়।

কালো রঙের ফোনটা বেজেই চলেছে। অশোক দু-চার মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। কে হতে পারে? নিশ্চয়ই পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবেন। কী ভেবে ফোনটা তুলে 'হ্যালো'— বলতেই ওধার থেকে রেখার গলা ভেসে এল, 'কী হল, এতক্ষণ ফোনটা বেজে গেল। ধরছিলে না কেন?'

চকিতে মনে পড়ল, তার প্রাইভেট নম্বরগুলোর একটা রেখাকেও জানিয়ে দিয়েছিল। টালিগঞ্জের মাঙ্গিরাম লাখোটিয়ার কেউ হবেন। কী ভেবে ফোনটা তুলে 'হ্যালো'— বলতেই ওধার থেকে রেখার গলা ভেসে এল, 'কী হল, এতক্ষণ ফোনটা বেজে গেল। ধরছিলে না কেন?'

অশোক বিব্রত হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে একটা অজুহাত খাড়া করল, 'একটা জরুরি ফাইল দেখছিলাম, তাই। হঠাৎ ফোন করলে? কিছু দরকার আছে?'

রেখা বলল, 'তোমার কাছে আমার নিজের কোনও প্রয়োজন নেই। সেসব অনেক আগেই চুকে-বুকে গেছে। যে কারণে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অশোক কাঁচুমাচু মুখে বলতে থাকে, 'প্লিজ রাগ কোরো না। এই হাউসে এসে আমি এমন একটা ফাঁদে ঢুকে পড়েছি, টালিগঞ্জে গিয়ে যে তোমার সঙ্গে দেখা করব—'

রুক্ষ, আবেগহীন গলায় রেখা বলল, 'দেশের একজন টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মুখে এসব সেন্টিমেন্টাল প্যানপ্যানানি মানায় না।'

'প্লিজ আমার কথাটা শোনো। এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে—'

রেখা কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুলল, 'তোমার কোনও কথা শোনার সময় আমার নেই। যা বলছি তা যদি শুনতে চাও তো শোনো, নইলে ফোন রেখে দিচ্ছি—'

'না না, বলো কী বলবে—' হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল অশোক।

'রমেশকাকার অবস্থা খুব খারাপ—'

'কোন রমেশকাকার কথা বলছ।'

'বা, বা, বা—' ধারালো ব্যঙ্গের সুরে রেখা বলতে লাগল, 'শিল্পপতি হবার পর স্মৃতিশক্তিটা নষ্ট হয়ে গেছে, নাকি অতীতটাকে ঝেড়ে-পুঁছে স্মৃতি থেকে বের করে দিয়েছ? আমি আমাদের বস্তির রমেশকাকা মানে রমেশ অধিকারীর কথা বলছি। যিনি তোমার মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফি দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে?'

অশোক চমকে উঠল। রমেশ অধিকারী ছিলেন কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। এমন সহৃদয় মানুষ হয় না। প্রবল আত্মসম্মানবোধ। স্কুলে কত আর মাইনে পেতেন সেই আমলে। টানাটানির সংসার। এদিকে তার হরনাথকাকাদের হালও সেই সময় খুব খারাপ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ফি'টা রমেশকাকা না দিলে অশোকের পড়াশোনার ইতি হয়ে যেত। পরে বিএ আর এমএ পড়ার দায়িত্বটা নিয়েছিল রেখা।

তীব্র অপরাধবোধ অশোককে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে দেয়। জড়সড় ভঙ্গিতে বলে, 'আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। কিছু হয়েছে রমেশকাকার?'

'তুমি টালিগঞ্জ থেকে চলে আসার আগে আগেই তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, মনে আছে?'

'স্মৃতিশক্তি নিয়ে আর লজ্জা দিও না। মনে আছে। রোগের পেছনে ওঁদের অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল।'

'ক'দিন আগে ফের একটা বড় ধরনের স্ট্রোক হয়। টাকা পয়সা আগেই প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। যেটুকু পড়ে ছিল তাও শেষ হবার মুখে। আমরা বস্তির সব ভাড়াটে কিছু কিছু করে দিয়ে হাজারখানেকের মতো তুলেছিলাম, কিন্তু ওঁদের আত্মসম্মানবোধ প্রবল। আমাদের টাকাটা ওঁরা নেননি। ডাক্তার বলেছেন, সময় আর বেশি নেই। যে কোনও দিন—'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। অশোক কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই রেখা আবার বলে ওঠে, 'যে কারণে ফোনটা করা, এবার শোনো। রমেশকাকা তোমার নামে একটা চিঠি লিখে রেখেছেন। পার্সোনাল চিঠি। তুমি যদি একটু কষ্ট করে আসতে পারো—'

চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে অশোকের, 'কী লিখেছেন রমেশকাকা?'

'জানি না। খামের চিঠি। মুখটা আঠা দিয়ে আটকানো।'

'আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি।' ফোন নামিয়ে তার পিএ পার্লের দিকে তাকাল অশোক, 'মিস শেঠনা, রাহেজা সাহেবকে ইমিডিয়েটলি আসতে বলুন—'

পার্লা তার টেবিলের ফোন তুলে নিল।

রাহেজা চেম্বারের দরজার সামনে আসতেই অশোক উঠে পড়ল, 'আমাকে এক্ষুনি টালিগঞ্জে আমাদের বস্তিতে যেতে হবে।'

রাহেজা অবাক হলেন ঠিকই কিন্তু কেন হঠাৎ অশোক টালিগঞ্জে যেতে চাইছে সে সম্বন্ধে কৌতূহলও হচ্ছে কিন্তু একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির পক্ষে শিল্প-সাম্যাজ্যের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে এ জাতীয় প্রশ্ন করা ধৃষ্টতা। তিনি বললেন, 'চলুন স্যর—'

॥ পাঁচ ॥

টালিগঞ্জের আঁকাবাঁকা একটা গলির শেষ মাথায় অশোক যেখানে থাকত অর্থাৎ মাঙ্গিরাম লাখোটিয়ার তৈরি করা সেই ঘিঞ্জি টাইপের বস্তিটা খুব ভালো করেই চেনেন রাহেজা। আগেও দু-তিনবার অশোককে নিয়ে এখানে এসেছেন।

বস্তিটার কাছাকাছি ললিতের চায়ের দোকান। সেটা এলাকার বেকার ছোকরাদের চিরস্থায়ী আড্ডাখানা। দুপুরে দু-এক ঘণ্টা বাদ দিলে সকাল থেকে রাত সাড়ে দশটা, এগারোটা অবধি গুলতানি চলতেই থাকে। চাকরি-বাকরি নেই, ললিতের টি স্টল ছাড়া কোথায়ই বা সময় কাটাবে?

চায়ের দোকানটার খানিকটা আগেই অশোকদের লিমুজিন থেমে গেল। কেননা এরপর গলিটা এত সরু যে লিমুজিনের মতো বড় গাড়ি সেখানে ঢুকবে না।

অশোক বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আপনি এখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করুন। আমি ঘুরে আসছি।'

রাহেজা যতবার এখানে এসেছেন চায়ের দোকানের জটলাটা তাঁর চোখে পড়েছে। দৃশ্যটা আজও একইরকম। অর্থাৎ ছোকরারা কয়েকটা বেঞ্চি দখল করে বসে আছে ঠিকই, তবে হইহল্লা নেই, নিচু গলায় তারা কথা বলছে।

ছোকরাগুলোর মুখ রাহেজার মোটামুটি চেনা। মাসখানেক আগে অশোককে নিয়ে একবার যখন এসেছিলেন এই ছোকরারা 'চাকরি', 'চাকরি' করে তার ওপর এমন হামলা চালায় যে মারাত্মক জখম হয়ে অশোককে দিন দশেক নার্সিংহোমে কাটাতে হয়েছে। আজও তেমন কিছু ঘটবে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

রাহেজা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আপনার পক্ষে একা যাওয়াটা রিস্কি হয়ে যাবে স্যর। টি স্টলের সেই ছোকরাগুলো—' বাকিটা আর শেষ করলেন না।

অশোক লিমুজিন থেকে নেমে পড়েছিল। রাহেজাও নামলেন। বললেন, 'চলুন স্যার, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আপনার সিকিউরিটিটা—'

তার এই মধ্যবয়সি প্রাইভেট সেক্রেটারিটি তাকে শুধু পছন্দ বা শ্রদ্ধাই করেন না, আন্তরিকভাবে ভালোও বেসে ফেলেছেন। রাহেজাকে থামিয়ে দিয়ে অশোক বলল, 'টেনশন করবেন না। ওরা একবার আমাকে নার্সিংহোমে পাঠিয়েছে ঠিকই, তবে আজ আর পাঠাবার ব্যবস্থা করবে বলে মনে হয় না। আসলে কাজকর্ম না পেয়ে যা হয়, ফ্রাসট্রেটেড হয়ে পড়েছে, তাই—'

অশোক বস্তির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার পেছন পেছন রাহেজাও। অশোক বলল, 'আপনাকে আসতে হবে না। প্লিজ গাড়িতে গিয়ে বসুন—'

চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আদেশ অমান্য করা যায় না, চন্দ্রকাঙ্ক রাহেজা দাঁড়িয়ে পড়লেন। অশোকের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ছোকরাগুলোর মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। কী যে করে বসবে?

অশোক ললিতের চায়ের দোকানটার কাছে চলে এসেছিল। যথারীতি রশেশ, ভল্টা, বল্টু, তপনরা জাঁকিয়ে বসে আছে। চকিতে তাদের একবার দেখে নিল সে। প্রবল বিদ্বেষ নিয়ে ওরা তাকে লক্ষ করছে। তবে সেদিনকার মতো হিংস্র ভঙ্গিতে দৌড়ে এসে তার ওপর চড়াও হল না।

মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে চলল অশোক।

'শ্লা শিল্পপতি আমাদের পাড়ায় ফের চক্কর মারতে এসেছে রে—' পেছন থেকে শব্দগুলো তিরের ফলার মতো ছুঁড়ে মারল ভল্টা।

রশেশ চড়া গলায় বলল, 'হারামিটার কত লম্বা লম্বা বাতেল্লা, কত হেভি হেভি ভাষণ, সমাজ বদলে দেব, সবার চাকরির ব্যবস্থা করব। হ্যান করেঙ্গে ত্যান করেঙ্গে, কোথায় গেল সেসব? শালা লব্ড়ু মাল—'

বল্টু গলার ভেতর থেকে আগুন উগরে দিল, 'মাকড়া তিরিশ-চল্লিশ লাখ টাকা দামের গাড়ি চড়ে। শুনেছি প্যালেসের মতো বাড়িতে থাকে। বেয়ারা, বাবুর্চি— সব হেভ্‌লি ব্যাপার। ক্লাবে গিয়ে ফরেন মাল খায়, মধুবালা, সুরাইয়া, বৈজয়ন্তীমালাদের মতো পরীদের হাত ধরে উড়ে বেড়ায়। এই খড়ড়া নাকি বেকারদের চাকরি-বাকরি দিয়ে সোসাইটি পাল্টে দেবে!'

অশোকের কানে সবই আসছিল। সে জানে টালিগঞ্জের এই এলাকায় এলেই তাকে এভাবেই অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেদিনের মতো যে হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়নি, সেটাই যথেষ্ট।

অশোক সোজা বস্তি বাড়িটার সামনে চলে এল। মাঝারাত অবধি এটার সদর দরজা হাট করে খোলা থাকে। সে ঢুকে পড়ল।

মাঝখানে চৌকো, মস্ত একটা ধুলো আর কাঁকরেভরা উঠোন ঘিরে সারি সারি ঘর। পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনি দেওয়া, মাথায় অ্যাসবেস্টসের ছাউনি, মেঝে অবশ্য সিমেন্টের।

মাঙ্গিরাম লাখোটিয়ার এই বস্তি-বাড়িটা সবসুদ্ধ বাইশটা উদ্বাস্তু ফ্যামিলির মাথা গোঁজার আস্তানা। দেশভাগের পর থেকে প্রায় দশ-এগারো বছর হয়ে গেল কোনও ফ্যামিলি একটা, কোনও ফ্যামিলি দুটো করে ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

উঠোনের বাঁ দিকে দু'খানা কামরা নিয়ে থাকে হরনাথরা। ডান পাশে থাকে রেখারা। আর সোজাসুজি উঠোনের ওধারে থাকে রমেশকাকারা।

অশোক লক্ষ করল, রমেশকাকা অর্থাৎ রমেশ অধিকারীদের ঘরের সামনে বস্তির অনেকেই জড়ো হয়েছে। সবাই নিচু গলায় কথা বলছে। পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে।

ভিড়ের ভেতর রেখা, তার দুই বোন শ্যামলী, যমুনা, তাদের বাবা ভূপাল বোস ছাড়া, অন্য কয়েকজন ভাড়াটে নরেশ ভট্টাচার্য, অতুল দেবনাথ, গোষ্ঠবিহারী পাল এবং মালতীকাকিমাদেরও দেখতে পেল অশোক।

রেখারাও তাকে দেখতে পেয়েছিল। খানিকটা এগিয়ে এসে রেখা বলল, 'এত তাড়াতাড়ি তুমি আসবে, ভাবতে পারিনি। চলো—'

ইদানীং ক্বচিৎ কখনও দেখা হলে বা ফোনটোন করলে রেখা খোঁচা মেরে কথা বলে। কথা তো নয়, সমানে ছল ফোটাতে থাকে। এখন কিন্তু সেরকম মনে হল না। বস্তিতে যখন সে থাকত তখন রেখাকে যেমন দেখেছে তেমনই স্বাভাবিক। তবে তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

ভটলা দেখে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল অশোকের। চরম কিছু কি ঘটে গেছে? অবশ্য তেমনটা হলে ঘরের ভেতর থেকে রমেশকাকার স্ত্রী আর ছেলে মমতাকাকিমা আর সুধীশের কান্নার আওয়াজ কানে আসত।

অশোক নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'রমেশকাকার ঘরের সামনে এত ভিড় কেন? কেমন আছে কাকা?'

রেখা বলল, 'তোমাকে তো ফোনে জানিয়েছি, সেকেন্ড একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। একটু আগে ডাক্তার এসেছিলেন; নতুন ইঞ্জেকশন আর ওষুধ শুরু হয়ে গেছে। এবার দেখা যাক। মাঝখানে গলা থেকে হিক্কার মতো শব্দ

উঠে আসছিল। খবরটা পেয়ে বাড়ির সবাই ভয় পেয়ে এখানে চলে এসেছে।'

অশোককে দেখে জটলার মধ্যে গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু কেউ তাকে কিছু বলল না। শুধু ভূপাল বোস অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বিড় বিড় করল, 'অশোক এসে গেছে, আর ভয় নেই।'

কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল অশোক। তার ওপর কোলকুঁজো, ক্ষয়াটে চেহারার এই লোকটির অগাধ আস্থা। বত্তির ছেলে হয়ে যে অশোক দেশের সেরা শিল্পপতি হতে পেরেছে, সে যে কোনও অসাধ্য সাধন করতে পারে। অজস্র টাকা ঢেলে অশোক রমেশ অধিকারীকে সুস্থ করে তুলবেই তুলবে, এতটাই বিশ্বাস ভূপালের।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে রেখা অশোককে রমেশকাকার ঘরে নিয়ে এল। একধারে তক্তপোষে ওপর চোখ আধবোজা করে শুয়ে রয়েছে রমেশ অধিকারী। তাঁর কাছাকাছি উঁচু মোড়ায় বসে আছে মমতাকাকিমা এবং সুধীশ। দু'জনেরই চোখে-মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা। বিছানার আরেক পাশে সস্তা, পুরনো টেবিলের উপর অজস্র ওষুধপত্র ডাই হয়ে আছে। আর রয়েছে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার।

মমতাকাকিমা আর সুধীশ উঠে দাঁড়াল। সুধীশের বয়স কুড়ি-একুশের বেশি হবে না। আই কম পাশ করে সবে সিটি কলেজে বি কম-এ ভর্তি হয়েছে।

মমতা বলল, 'তুই এসেছিস বাবা; তোর কথা ক'দিন ধরে কতবার যে তোর কাকা বলেছে! কবে এই বস্তিতে আসবি, আর আসবি কি না, শুধু এক কথা। শেষ পর্যন্ত তোর কাকা আশা ছেড়েই দিয়েছিল।'

অশোকের অস্বস্তি হচ্ছিল। সে দেশের একজন বড় শিল্পপতি হয়েছে বলে এখানে আসবে না! কী ভাবে এরা? সে কি আর আসল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট? রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারা কত ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে। নায়ক, খলনায়ক, কমেডিয়ান, মহাপুরুষ, দুষ্চরিত্র, মাতাল, পাগল ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিনয়টা কেউ করে শখে, কেউ বা খ্যাতি কি পয়সার জন্য। শখ মেটানো, অজস্র অর্থ বা অঢেল আরামে বিলাসে ভেসে যাওয়া— এর কোনওটার জন্যই সে গায়ে শিল্পপতির খোলসটা চড়ায়নি। যে মিশন নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের চূড়োয় গিয়ে বসেছে সেটা পূরণ হলেই সমস্ত ছেড়েছুড়ে সে মাঙ্গিয়ার মাড়োয়ারির এই বস্তিতে ফিরে আসবে।

অশোক বলল, 'আমি জানতাম প্রথম স্ট্রোকটা হবার পর কাকা ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিল। মোটামুটি সুস্থও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপরও যে আরেকটা স্ট্রোক হয়েছে কী করে জানব? আমি তো আর এখানে থাকি না। আজ রেখার ফোনটা পাওয়ার পর এক মিনিটও দেরি করিনি, সব কাজ ফেলে চলে এসেছি। তোমরা যদি চাও কাকাকে বড় নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে পারি।'

মমতা জিজ্ঞেস করল, 'নার্সিংহোম কাকে বলে?'

রেখাও ঘরের ভেতর চলে এসেছিল। উত্তরটা সে-ই দিল, 'কোটিপতিদের হাসপাতাল।'

মমতা বলল, 'ডাক্তার ধর কিছুক্ষণ আগে এসে দেখে গেছেন। বললেন, রুগির হাল ভালো না, ডান দিকটা পড়ে গেছে।'

অশোক চমকে উঠল। 'পড়ে গেছে' মানে পক্ষাঘাত হয়েছে। ডাক্তার ধর অভিজ্ঞ হার্ট স্পেশালিষ্ট, একটা নামকরা সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। খুবই ভালো মানুষ। চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে। টাকা-পয়সার খাই নেই। এই পাড়াতেই থাকেন।

মমতা বলল, 'তোর কাকার ডান দিকটায় একটুও সাড় নেই। ডান হাত, ডান পা, উরু কিচ্ছু নাড়তে পারে না। কথাও পষ্ট করে বলতে পারে না। জড়িয়ে-মড়িয়ে যা বলে তার প্রায় কিছুই বোঝা যায় না। ধর ডাক্তার বলে গেছে, এই অবস্থায় রুগিকে নাড়াচাড়া করা যাবে না।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

মমতাকে শান্ত করে অশোক বলল, 'ডাক্তার ধর খুব বড় ডাক্তার। তিনি যেমন দেখছেন তেমনি দেখুন। কিন্তু রমেশকাকার সেবাযত্নের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার নার্স রাখা দরকার।'

কাদের নার্স বলে, তারা কী ধরনের কাজকর্ম করে, মমতা তা জানে। বলল, 'সেবা-টেবা যা করার আমিই করব।'

অনেক বোঝাল অশোক, কিন্তু মমতা গোঁ ধরেই রইল। স্বামীর সেবার ভার সে অন্য কারও হাতে তুলে দেবে না।

রমেশ অধিকারীর শরীরের ডান পাশটায় সাড় নেই। অশোক তার বাঁ দিকে চলে এল। আনেকটা ঝুঁকে ডাকতে লাগল, 'রমেশকাকা, রমেশকাকা—'

বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর রমেশ বোধহয় শুনতে পেল। আধবোজা চোখ দুটো মেলে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকাল। তার গলার ভেতর থেকে কিছুক্ষণ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'কে, কে তুমি?'

অশোক বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল। দু'নম্বর হার্ট-অ্যাটাকটা রমেশ অধিকারীর শরীরের ডান পাশটা অসাড় করে দেওয়া ছাড়াও তার স্মৃতিশক্তিকেও কি চিরকালের মতো পঙ্গু করে দিয়েছে?

অশোক বলল, 'আমি অশোক। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন না, তাই চলে এলাম—'

রমেশ অধিকারী অস্বাভাবিক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে স্মৃতির যে ভাঙাচোরা টুকরো-টাকরা এখনও থেকে গেছে তার ভেতর সমানে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল।

অশোক বলেই চলেছে, 'আমি এই বাড়িরই ছেলে। আমার ম্যাট্রিক তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফি আপনিই দিয়েছিলেন, ছুটির দিনে ঢাকুরিয়া লেকের ধারে এ বাড়ির ছেলেদের নিয়ে ফুটবল খেলতে যেতেন, তাদের মধ্যে আমিও থাকতাম। আই এ পরীক্ষায় আমি ফিফথ হয়েছিলাম, তখন আপনার সে কী আনন্দ; 'নেতাজি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' থেকে তিন হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে এনে এ বাড়ির সবাইকে খাইয়েছিলেন। একবার বাস অ্যাকসিডেন্টে আমার পা ভেঙে গিয়েছিল, হরনাথকাকা আর আপনি আমাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেছিলেন। রোজ বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে আমাকে দেখতে যেতেন— মনে পড়ছে? পুরনো দিনের এমন টুকরো টুকরো অজস্র ঘটনার কথা একের পর এক বলে যেতে লাগল অশোক।

শুনতে শুনতে একসময় রমেশ অধিকারীর মনে, নাকি অন্য কোথাও তীব্র আলোড়ন শুরু হল। মুখের বাঁ দিকটা বারবার কুঁচকে যাচ্ছে। বাঁ হাতে, বাঁ পায়ে, উরুতে কেমন একটা আনচান আনচান ভাব। হারানো স্মৃতিটা হয়তো একটু-আধটু ফিরে আসছে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে অশোকের কাঁধের উপর রাখল রমেশ অধিকারী। অস্পষ্ট জড়ানো গলায় ভেঙে ভেঙে বলল, 'তু-ই অ-শো-ক। তোকে-এ-এ দরকা-কা-রা।'

'বলুন রমেশকাকা, কী দরকার? আমাকে কী করতে হবে?' অশোক রমেশের দিকে আরও ঝুঁকল।

'এ-ক-টা চিঠি। এ-ক-টা চিঠি—' দু'বার একই কথা বলল রমেশ অধিকারী।

'কীসের চিঠি?'

'পা-র্সো-না-ল। ব্য-ক্তি-গ-ত—' সামান্য কয়েকটা কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিল রমেশ। বাঁ হাতটা বেঁকিয়ে বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলটা দিয়ে নিজের মাথার বালিশটা দেখিয়ে দিল।

অশোক হতভম্ব। পার্সোনাল চিঠির সঙ্গে বালিশের কী সম্পর্ক, মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

মমতা বুঝিয়ে দিল, প্রথম স্ট্রোকটা হবার পর রমেশ অধিকারী যখন কিছুটা সুস্থ সেই সময় তার মনে কেমন একটা মৃত্যুভয় ঢুকে গিয়েছিল। সে যেন ভবিষ্যতের কোনও ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছিল। সারাক্ষণ তার মনে হতো প্রথম হার্ট-অ্যাটাকটাই শেষ নয়, আরও মারাত্মক কিছু তার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন একটা

চিঠি লিখে নিজের কাছেই রাখত। মমতাকে বলেছিল, যদি সত্যি সত্যিই তেমন কিছু হয় এই চিঠিটা যেন অশোককে দেওয়া হয়। রমেশ অধিকারীর নির্দেশ ছিল এটা একেবারে ব্যক্তিগত চিঠি। অশোক ছাড়া আর কেউ যেন এটা না পড়ে। দু'নম্বর অ্যাটাকটা হবার পর স্মৃতিশক্তির অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেলেও আকারে-ইঙ্গিতে চিঠিটা তার বালিশের তলায় রেখে দিতেই শুধু নয়, অশোককে খবর দিয়ে এনে ওটা তার হাতে তুলে দিতে বলেছে।

কী এমন আছে এই চিঠিতে যা অশোক ছাড়া অন্য কারও পড়া নিষেধ? মাথার ভেতরটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল তার। বলল, 'কাকিমা, আমার যতদূর মনে আছে, রমেশকাকার প্রথম হার্ট-অ্যাটাকটা মাস পাঁচেক আগে হয়েছিল। তুমি বলছ তার কিছুদিন পর এই চিঠিটা লিখেছিল কাকা।'

মমতা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'এতদিন আগের লেখা চিঠি দু'নম্বর স্ট্রোকটা হবার পর রমেশকাকা আমাকে দিতে বলেছে! আরেকটা স্ট্রোক যে হবে কাকা কি তা জানত?'

'হার্টের অসুখ হবে তা জানত না। তবে বড় ধরনের একটা কিছু যে হবে, সব সময় সেটা তার মনে হতো। মুখ ফুটে না বললেও একটা আতঙ্ক তোর কাকার মাথায় যে ঢুকে গিয়েছিল তা আমি বুঝতে পারতাম।'

'এত লোক থাকতে কেন আমাকে চিঠিটা লিখেছে, তুমি জানো?'

'না। তবে তুই যখন অনেক বড় বড় কল-কারখানার মালিক হলি, খবরের কাগজে তোর ছবি বেরুতে লাগল, প্রচুর নামডাক হল, তখন থেকে তোর কাকা তোর কথা খুব বলত। একদিন একটা চিঠি লিখে বলল, 'ফের যদি আমি কোনও বড় রকমের ব্যারামে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি, এই চিঠিটা তাকেই দেবে। অন্য কারও হাতে এটা যেন না পড়ে।'

ওদিকে অস্থিরতা বাড়ছিল রমেশ অধিকারীর। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে মাথার বালিশটা সমানে দেখাচ্ছে সে।

ইঙ্গিতটা ধরতে পারল মমতা। বালিশের তলা থেকে একটা লম্বা ব্রাউন রঙের খাম বের করে অশোকের হাতে দিল।

খামটার মাঝামাঝি জায়গায় অশোকের নামটা লেখা। আর ওপরের দিকে কোনাকুনি একটা লাইন: ব্যক্তিগত। অশোক, এই চিঠি অন্য কারও সামনে নয়, গোপনে পড়বি।

এমন অদ্ভুত চিঠি আগে আর কখনও পায়নি অশোক। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর কী ভেবে খামটা দু'ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে দেয়।

রমেশ অধিকারী তার দিকে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে জড়ানো, ভাঙা গলায় কী যেন বলতে লাগল, তার একটা বর্ণও বোধগম্য হল না। অশোক জিগ্যেস করল, 'কাকিমা, রমেশকাকা এত অস্থির হয়ে উঠল কেন? আর কী সব বলছে!'

পক্ষাঘাতে-পঙ্গু একটি মানুষের পাশে দিবা-রাত্রি কাটাতে কাটাতে তার ইশারা-ইঙ্গিত, অস্পষ্ট জড়ানো জড়ানো গলায় সে যা বলে সবই বুঝতে পারে মমতা। বলল, 'চিঠিটা দেবার জন্যে তোর কাকা তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কাজটা হয়ে গেছে। তুই আর রুগির পাশে থাক, সে চাইছে না। চলে যা বাবা—'

রেখা বলল, 'ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, পেশেন্টের যা হাল তার পক্ষে সামান্য উত্তেজনাও ভীষণ ক্ষতিকর। তুমি থাকলে সমানে হাত নাড়তে থাকবে আর চেঁচাবে। রমেশকাকা যখন চাইছে না, চলেই যাও।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল অশোকের। রেখার ফোনটা পেয়েই সে এখানে চলে এসেছে। এই দুঃসময়ে বড় নার্সিংহোমে রমেশ অধিকারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তা সম্ভব হল না। ভেবেছিল অনেকক্ষণ রমেশকাকার পাশে বসে তাকে সঙ্গ

দেবে। কিন্তু এই পেশেন্ট তা চায় না। রেখা যা বলেছে তার শতকরা একাংশ ভাগ ঠিক। হার্ট-অ্যাটাকের পেশেন্টের পক্ষে উত্তেজনা মারাত্মক। যে কোনও মুহূর্তে চরম কিছু ঘটে যেতে পারে। অগত্যা চলে যেতেই হবে।

অশোক মমতাকে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'কাকিমা, রমেশকাকার জন্যে অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে। যদি রাগ না করো, একটা কথা বলব?'

মমতা তার দিকে তাকাল, 'কী কথা?'

'আমি কিছু টাকা দিয়ে যেতে চাই। কাকার এই রোগে—বুঝতেই পারছ—'

'না না—' জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল মমতা, 'তোর কাকা কেমন মানুষ, জানিস তো। কারও দান বা দয়া কোনও দিন নেয়নি। মরে গেলেও নেবে না। যদি জানতে পারে তুই টাকা দিয়ে গেছিস—'

'কাকিমা, আমি তোমাদের ছেলের মতো। রমেশকাকা এই অবস্থায় পড়ে আছে আমাকে ফিরিয়ে দেবে?'

'এখনও আমার হাতে যা আছে তাতে চিকিৎসাটা চালিয়ে নিতে পারব। এ নিয়ে তুই আর কিছু বলিস না—' অশোককে আর কোনও সুযোগ না দিয়ে দূরে সরে গেল মমতা।

বিষণ্ণ মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অশোক। তারপর রমেশ অধিকারীর বিছানার কাছে এসে বলল, 'কাকা এখন চললাম। —মমতাকাকিমা, যাচ্ছি।'

রমেশ অধিকারী বাঁ হাতটা নাড়ল। গোঙানির মতো আওয়াজ করে কী বলল, বোঝা গেল না।

মমতা বলল, 'আবার আসিস।'

অশোক ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। রেখাও তার সঙ্গে এসেছে।

দরজার বাইরে ভিড়টা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। অশোক যখন রমেশ অধিকারীর ঘরে ঢুকেছিল, কেউ তাকে কিছু বলেনি। এবার এই বস্তি বাড়িরই ভাড়াটে নরেশ ভট্টাচার্য, অতুল দেবনাথ, গোষ্ঠবিহারী পালেরা অশোককে ছেঁকে ধরল। ভূপাল বোস অবশ্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'রুগিকে কেমন দেখলে বাবা? রমেশ মাস্টার এত বড় ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারবে তো?'

অশোক বলল, 'আমি ডাক্তার নই। ডাক্তার ধর ওঁকে দেখছেন। আপনারা সবাই জানেন লোকে ওঁকে ধন্বন্তরি বলে। আশা করি রমেশকাকা সুস্থ হয়ে উঠবে।'

নরেশ ভট্টাচার্য বলল, 'রমেশ মাস্টারদের কী হাল, আমরা জানি। নিশ্চয়ই তুমি তার চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলে—'

লোকটা কী ইঙ্গিত দিয়েছে, বুঝতে পারছিল অশোক। বলল, 'আমি শুধু রমেশকাকার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলাম। একটি পয়সাও দিইনি। একই বাড়িতে এতকাল ধরে তো আছেন। রমেশকাকারা কেমন মানুষ জানেন না? ওরা কারও অনুগ্রহ বা দয়া পছন্দ করে না।'

শুধু নরেশ ভট্টাচার্যই নয়, বাকি সবাই গলা বাড়িয়ে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে ছিল। অশোক একটা কানাকড়িও দেয়নি শুনে কতটা বিশ্বাস করল, তারাই জানে। তবে এ নিয়ে আর কিছু জানতে চাইল না। তবে নানা প্রসঙ্গে চলে গেল। একসঙ্গে সবাই ব্যাকুলভাবে বলতে লাগল—

'অশোক, আমাদের ব্যাপারটা কী হল?'

'বাবা, তুমি ছাড়া আমাদের গতি নেই—'

'একটু দয়া কর অশোক। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।'

'কী কষ্টে যে দিন কাটছি! বড্ড কষ্ট। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি—'

অশোক দেশের একজন বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবার পর যে দু-চারবার এই মাঙ্গিরাম লাখোটিয়ার বস্তিবাড়িটায় এসেছে, এখানকার ভাড়াটেরা তাকে ছেঁকে ধরেছে। এদের একটাই আর্জি— কারও বেকার ছেলে, কারও ভাইপো, কারও ভাগ্নে বা ভাইকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে অশোককে। নইলে উপোস করে মরতে হবে।

রেখা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। সে অশোককে বাঁচিয়ে দিল। ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'ও এসেছে একজন রুগিকে দেখতে। কেন ওকে বিরক্ত করছেন? যেতে দিন—'

সবাই মিইয়ে গেল। সরে সরে পথ করে দিতে দিতে দু-একজন বলল, 'অশোক আমাদের আপনজন। ছেলের মতো। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে ওকে দেখছি। ওর হাতে কত ক্ষমতা। অশোক ইচ্ছে করলেই—'

তাদের থামিয়ে দিল রেখা, 'ওসব চাকরি-বাকরির কথা পরে হবে। ও এলেই যদি চাকরি-বাকরি করে ঘ্যান-ঘ্যান করেন, আর কখনও কি আসবে?' অশোককে বলল, 'চল—'

অন্য সবাইকে দমানো গেলেও রেখার বাবা ভূপাল বোসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। জোঁকের মতো অশোকের গায়ে সে সেঁটে রয়েছে। তার মুখ-চোখের চেহারা দেখে আঁচ করা যায় লোকটা কিছু বলতে চায়। কী বলবে, অশোক তা জানে। তবু জিগ্যেস করল, 'কিছু বলবেন?'

বারকয়েক ঢোঁক গিলে ভূপাল বোস বলল, 'কারও চাকরির জন্যে ঘ্যান-ঘ্যান করে তোমার মাথা খারাপ করব না। এতদূর এসেই ফিরে যাবে, তাই কখনও হয়। আমাদের ঘরে চল, একটু জিরিয়ে-টিরিয়ে নাও। তার ভেতর দু-চারটে কথা বলব। অনেকদিন পর এলে, আবার কবে দেখা হবে তার তো ঠিক নেই, তাই—'

অশোক বলল, 'রমেশকাকার খবরটা পেয়েই চলে এসেছি। এখন আমাকে অফিসে ফিরতে হবে। যদি কিছু বলার থাকে এখানেই বলুন—'

ভূপাল বোস গলা নামিয়ে বলল, 'তোমার আর রেখার ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে ঝুলে আছে। বুঝতেই পারছ, আমি ওর বাপ তো—'

কড়া ধমকে রেখা তাকে থামিয়ে দিল, 'বাবা, কখন কোথায় কাকে কী বলতে হয়, তোমার সেই কাণ্ডজ্ঞানটা নেই।'

ভূপাল বোস লহমায় নিজেকে গুটিয়ে নিল। তার কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কাঁপা কাঁপা শুকনো গলায় বলল, 'ঠিক আছে ঠিক আছে—' রমেশ অধিকারীর ঘরের সামনে সেই জটলাটা এখনও রয়েছে। ভূপাল সেদিকে চলে গেল।

রেখা আর অশোক সদর দরজার কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে, সেই সময় মালতী পেছন থেকে ডাকতে ডাকতে চলে এল, 'অশোক— অশোক—'

অশোকরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মালতী বলল, 'কী ছেলে রে তুই! এখানে এসে একবার নিজেদের ঘরে গেলি না! এর মধ্যে এতটাই পর হয়ে গেছিস!' তার গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

হরনাথ আর মালতী, বিশেষ করে মালতী অশোকের মা-বাবা মারা যাবার পর অপার মমতায় তাকে মানুষ করে তুলেছে। এই বস্তিতেই তাদের কাছে জীবনের কতগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছে সে।

অশোক ঝুঁকে মালতীর দু'পায়ে দু'হাত রেখে বলল, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে কাকিমা। নানা কারণে মাথাটা গোলমাল হয়ে আছে। তাই ভুল করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও—'

'দূর বোকা ছেলে— ওঠ— ওঠ—'

অশোক উঠে দাঁড়াল। কিন্তু অপরাধবোধে মালতীর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। বলল, 'ঘরে চলো কাকিমা—'

কী ভেবে মালতী বলল, 'তোর বোধহয় খুব তাড়া রয়েছে, তাই—'

'যত তাড়াই থাক, তুমি চলো—'

দিনের এই সময়টা হরনাথদের দু'খানা ঘর প্রায় ফাঁকা।

একমাত্র মালতী ছাড়া আর কেউ থাকে না। আজও নেই। হরনাথকাকার দুই ছেলে নান্টু আর ঝন্টু আর এক মেয়ে সোনা এখন স্কুলে। তাদের ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে।

অশোক এতকাল যে ঘরে কাটিয়ে গেছে সেই ঘরটাতেই ঢুকে তক্তপোষের বিছানায় আধশুয়ো বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে পড়ল।

মালতী হাঁ হাঁ করে উঠল, 'এটা কী করলি রে! দামি দামি জামাপ্যান্ট পরে কেউ ওই নোংরা বিছানায় কাত হয়ে পড়ে!'

'কাকিমা এটা আমার ঘর। এতকাল তো এই বিছানায় শুয়েছি, বসেছি। একটা কাজে ক'টা দিনের জন্যে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে হচ্ছে। দামি পোশাকও পরতে হচ্ছে। তাই বলে তুমি আমাকে পর করে দিতে চাইছ! কেন বোঝো না, আমি তোমাদের ছেলে, তোমাদেরই আছি!'

একটু আগে মালতী তাকে পর হবার কথা বলে খোঁচা দিয়েছিল। এবার অশোক পাল্টা খোঁচাটা দিল।

মালতী লজ্জা পেয়ে গেল, সেই সঙ্গে খুশিও হল। বলল, 'তোকে দুঃখ দেবার জন্যে বলিনি বাবা। রাগ করিস না।'

অশোক বলল, 'তোমার ওপর রাগ করতে পারি কাকিমা! গলাটা শুকিয়ে গেছে, এক গ্লাস জল দাও—'

মালতী ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'শুধু জল কি দেওয়া যায়। নারকেল নাড়ু বানিয়েছিলাম। খাবি?'

'এক্ষুনি নিয়ে এসো। কতদিন তোমার হাতের নাড়ু, মোয়া, চন্দ্রপুলি যে খাইনি—'

মালতী পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরেই দুটো কাঁসার রেকাবিতে নাড়ু আর দুটো কাচের গ্লাসে জল নিয়ে ফিরে এল। শুধু অশোকের জন্যই নয়, রেখার জন্যও।

রেখা বলল, 'আবার আমাকে কেন কাকিমা?'

চোখ পাকিয়ে আদরের সুরে মালতী বলল, 'যা দিয়েছি, লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নে—'

মালতী এমন একজন মানুষ যার মুখের ওপর না বলা যায় না। খেতে খেতে রমেশ অধিকারীর কথা উঠল। মালতী জিগ্যেস করল, 'রমেশদাদাকে তো দেখে এলি। কী মনে হল তোর?'

অশোক বলল, 'ভালো নয়। মনে হল ওদের হাতে বেশি টাকা-পয়সা নেই। মমতাকাকিমাকে আমি কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম। কিছুতেই নিতে রাজি হল না। কী করে যে এত বড় একটা রোগের চিকিৎসা চালাবে!'

মালতী বিমর্ষমুখে বলল, 'ওদের খুব আত্মসম্মানবোধ। মরে গেলেও কারও কাছে হাত পাততে চায় না।'

'এটা কি কাজের কথা হল! লোকটাকে তো বাঁচানো দরকার। কাকিমা, তোমার কাছে কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি। রমেশকাকার রোগটা যদি হঠাৎ আরও খারাপের দিকে যায় টাকা লাগবে। এই বস্তিবাড়িতে হরনাথকাকা আর তুমি কিছু বললে সবাই তা মেনে নেয়। মমতাকাকিমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দরকার মতো টাকাটা দিও।'

মালতী বলল, 'দেখ বাবা, তুই তো জানিস, আমার বড্ড ভুলো মন। কোথায় কী রাখি, মনে থাকে না। তুই বরং টাকাটা রেখার কাছে রেখে যা। তেমন বুঝলে ওর কাছ থেকে চেয়ে মমতাদিদিকে দেবো।'

রেখা প্রথমটা আপত্তি করছিল। পরে দোনোমনো করে রাজি হল। টাকার অঙ্কটা কম নয়— তিরিশ হাজার।

নাড়ু-টাড়ু খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আরও কিছুক্ষণ কথা-টথা বলে উঠে পড়ল অশোক, 'কাকিমা, এবার আমাকে যেতে হবে। কিছু কাজ ফেলে চলে এসেছি। চলি—'

মালতী বলল, 'আবার কবে আসবি বাবা?'

'আমার কাজের ভীষণ চাপ। তারই ফাঁকে সময় করে চলে আসব। হরনাথকাকা, নান্টু, ঝন্টু আর সোনার সঙ্গে দেখা হল না। খুব খারাপ লাগছে। আমার কথা ওদের বোলো।'

ঘরের বাইরে এসে উঠোনে নেমে পড়ল অশোক। তার পাশাপাশি রেখাও। মালতী ঘরের বারান্দায় করুণ মুখে অশোকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের সন্তানরা জন্মাবার অনেক আগে থেকেই অশোককে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে সে ওর গর্ভধারিণী নয় ঠিক, কিন্তু তার চেয়ে কি এতটুকু কম! ছেলেটা বেশ কিছুদিন হল তার কাছে থাকে না, সে জন্য সব সময় তার মন ভার হয়ে থাকে।

রেখা আর অশোক উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার কাছে চলে গিয়েছিল। অশোক বলল, 'রমেশকাকার কন্ডিশন কখন কীরকম হয় আমাকে জানিও। আরও টাকার হয়তো দরকার হবে। তক্ষুনি ফোন কোরো। আর—আর—'

রেখা অশোকের চোখের দিকে তাকাল, 'আর কী?'

অশোক বলল, 'কতদিন হয়ে গেল তোমাকে নিয়ে আগের মতো কোথাও গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে গল্প করে কাটিয়ে বা ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াব তার উপায় নেই। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত প্রত্যেকটা দিন নানা প্রোগ্রামে ঠাসা। মিটিং, প্রেস কনফারেন্স, চেম্বারস অফ কমার্সে অনুষ্ঠান, এখানে ছোটা, ওখানে ছোটা— নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। একটা খাঁচার ভেতর আটকে গেছি। নিজের কোনও ফ্রিডম নেই। তোমাকে এত মিস করি—'

নিষ্পৃহ গলায় রেখা বলল, 'ওসব কথা থাক—'

অশোক বলল, 'আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি। ভুল বুঝো না।' টেরে পেল, তার বুকের ভেতর থেকে আবেগের মতো কিছু একটা উথলে উঠে আসছে।

রেখা উত্তর দিল না।

অশোক বলতে লাগল, 'আমি কোন পারপাসে এখান থেকে চলে গেছি, তুমি তা জানো। সারাক্ষণ আমাকে কী প্রচণ্ড প্রেশারের মধ্যে থাকতে হয়, ভাবতে পারবে না। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সোমদের চ্যাটার্জি, যাঁর সিংহাসনে গিয়ে আমি বসেছি তিনি বলেন, আমি নাকি একটা চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছি। হয়তো মজা করেই বলেন। কিন্তু কথাটা ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি। যা করতে চাই তাতেই বাধা। মনে হয় আমার চারপাশে উঁচু উঁচু দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলো ভেঙেচুরে নিজের কাজটা যে করব, এখন পর্যন্ত তার কিছুই করে উঠতে পারিনি। একেক সময় ভাবি সব ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে আসি। তখনই মনে হয় হোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড আমার দিকে আঙুল তুলে হো হো করে হাসতে হাসতে বলবে, 'ডিফিটিস্ট। লম্বা লম্বা বুলি কপাচানোর পর লেজ গুটিয়ে সরে পড়ল। আমি কিন্তু সহজে ছাড়ব না। আরও কিছুদিন দেখতে চাই—'

রেখা বলল, 'তোমার চ্যালেঞ্জ, তুমিই বুঝবে। আমাকে এসব শুনিয়ে কী লাভ?'

অশোক বলল, 'আমি তোমার কাছে আরও খানিকটা সময় চাই। না বোলো না—'

রেখা একটু আলগাভাবে হাসল, 'আমার বলার আর কী আছে, শুধু শুনে যাব। ওই যে দূরে তোমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর দেরি কোরো না।'

রেখার মনে ক্ষোভ, অভিমান বা দুঃখ যে দিন দিন জমা হচ্ছে তা কি আর বুঝতে পারছে না অশোক! চকিতে ভেবে নিল যত কাজই থাক তার ভেতর থেকে একটা দিন বের করে রেখার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেবে। তার মনে যে কষ্ট পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যতক্ষণ না তা মিলিয়ে যায় তার পাশেই বসে থাকবে। বুঝিয়ে দেবে শিল্পপতির মেক-আপটা গায়ে চড়ানোর আগে সে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। লেশমাত্র বদলায়নি।

অশোক বলল, 'তুমিও বাড়ির ভেতর চলে যাও।'

'হ্যাঁ, যাব। ললিতের চায়ের দোকানে ভন্টা, রণেশ, বল্টুরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিনের মতো ঝামেলা করতে পারে। আমি আছি, কিছু করবে না।'

একসময় রেখা আর অশোককে যথেষ্ট সমীহ করত রশেশরা, সম্মান দিয়ে কথা বলত। কিন্তু অশোক যখন শিল্পপতি হল কিন্তু ওদের চাকরি-টাকরির বন্দোবস্ত করতে পারল না তখন থেকেই ওরা খেপে আছে। সেদিন তো তার গাড়ি ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছিল। শুধু তাই না, তাকেও মেরেধরে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল। রেখার জন্য বেঁচে গিয়েছিল। রেখাকে এখনও ওরা সম্মান করে। তার সামনে কোনওরকম ইতরামো করে না।

রেখা বলল, 'তুমি জানো রশেশরা কতটা চেণ্ড করে গেছে! সারাদিন চায়ের দোকানে আড্ডা মারে আর তোমার চোদ্দোপুরুষের শ্রাদ্ধ করে।'

অশোক বলল, 'তাই নাকি! এ তো মহৎ কর্ম। আমি কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে ওদের সামনে দিয়েই বাড়িতে এসেছিলাম।'

'ওরা তোমাকে কিছু বলেনি?'

'কী আবার বলবে, গীতার শ্লোক আওড়াচ্ছিল। আচ্ছা চলি—'

অশোক আর দাঁড়াল না। চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে, রশেশরা আগের মতোই নোংরা নোংরা শব্দগুলো তার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। তবে নিচু গলায়, রেখা যাতে শুনতে না পায়।

ভণ্টো নতুন কিছু জুড়ে দিল, 'শ্লা, শিল্পপতিদের সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলোর পেছনে চক্কর মারছে, বস্তির মেয়ে আমাদের রেখাদিকেও ছাড়ছে না। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কেমন কানকি মারছিল দেখলি—'

ভণ্টাদের দিকে ফিরেও তাকাল না অশোক। সোজা তার লিমুজিনের কাছে চলে এল। শোফার লক্ষ লক্ষ টাকা দামের গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রাহেজা সামনের দিকে শোফারের পাশে ফ্রন্ট সিটটায় বসে আছেন।

শোফার ব্যাকসিটের দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে বসতে বসতে অশোক বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আপনি আমার কাছে চলে আসুন—'

বিশাল এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের চেয়ারম্যান-কাম-এমডি তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে পাশে বসতে বলছে। ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েন রাহেজা। বলেন, 'কিন্তু স্যর—'

'আপনি আমাকে বস ভাবছেন কেন? আমি কি কখনও সেরকম ব্যবহার করেছি? মনে করুন আমি আপনার একজন বন্ধু।'

এই যুবকটি যে নাক-উঁচু, দাম্ভিক, সাধারণ মানুষকে পোকা-মাকড়ের মতো মনে করে, সেই সব ট্র্যাডিশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের থেকে আলাদা, সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের, রাহেজা তা আগেই বুঝতে পেরেছেন। তিনি পেছনের সিটে এসে বসলেন। তবে সংকোচটা পুরোপুরি কাটল না।

গাড়ি চলতে শুরু করল। অশোক বলল, 'আপনাকে আমার জন্যে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হল। সরি মিস্টার রাহেজা—'

'এ আপনি কী বলছেন স্যার। এ তো আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে। স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব?'

'জানি, আমার খারাপ লাগে এমন কিছুই আপনি বলবেন না। যা বলতে চান বলুন—'

একটু ইতস্তত করে রাহেজা বললেন, 'আপনি স্যর ওই বস্তি এলাকাটায় আর আসবেন না।'

'কেন বলুন তো?' অশোক সোজাসুজি রাহেজার চোখের দিকে তাকাল।

'ওই টি স্টলটায় যারা বসেছিল তারা জঘন্য টাইপের ছোকরা। সেদিন আপনার ওপর হামলা চালিয়েছিল। বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটা মোটামুটি বুঝতে পারি। অনেকদিন কলকাতায় আছি তো। আজ আপনি ব্লামে ঢুকে যাবার পর সারাক্ষণ ওরা আপনার সম্বন্ধে যা বলছিল, ভাবা যায় না। ডার্টি ব্ল্যাং। আপনি দেশের একজন ফোরমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এইরকম একটা অ্যাটমোস্ফিয়ারে আপনার আসা ঠিক হবে না।'

'মিস্টার রাহেজা, এই জায়গাটা আমার রুটা। এখানে আমাকে আসতেই হবে। এখন ওই ছেলেগুলোর কাথা বলেন না? ওরা কেউ হাইলি-এডুকেটেড নয়। একটু-আধটু লেখাপড়া সবাই শিখেছে। কারও কারও ইউনিভার্সিটির দু-একটা সার্টিফিকেট বা ডিগ্রিও আছে। বছরের পর বছর ইন্সটারভিউ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাজকর্ম কিছুই জুটছে না। দে আর টোটালি ফ্রাসট্রেটেড। বেকারত্ব মানুষকে কোন লেভেলে নামিয়ে দেয় ভাবতে পারবেন না। কেউ কেউ মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে যায়, কেউ কেউ ক্রিমিনাল। আমাদের সিস্টেম তাদের পাগল, নইলে খুনি-ডাকাত বানিয়ে দিচ্ছে। ইয়ং জেনারেশনের বেশির ভাগটাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আন-এমপ্লয়মেন্ট যে কত বড় কার্স, কোনও ব্লামে গিয়ে কেউ যদি মাস কয়েক কাটায়, জানতে পারবে।'

অশোক সম্বন্ধে খানিকটা ভাসা ভাসা ধারণা ছিল চন্দ্রকান্ত রাহেজার। সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে একটা রেভিলিউশন ঘটিয়ে সোশ্যাল সিস্টেম পাল্টে দিতে চায়, এরকমই তিনি জানতেন। কিন্তু এসবের মূল কারণটা কী, এতদিনে তাঁর কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেল। রাহেজা সোসাইটির হাই-আপদের ফ্যামিলির তরণদের এতকাল দেখে আসছেন। তাঁদের সঙ্গে অশোকের আদৌ কোনও মিল নেই। সমাজের নিচু স্তরের মানুষদের নিয়ে কেউ এত ভাবতে পারে, কখনও কল্পনা করেননি রাহেজা! পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এই যুবকটি সম্পর্কে প্রথম দিকে তাঁর কৌতূহল ছিল। পরে শ্রদ্ধাও হচ্ছিল। আজ সেই শ্রদ্ধাটা অনেকটাই বেড়ে গেল। নিঃশব্দে তিনি তাকিয়ে থাকেন।

অশোক এবার বলল, 'মিস্টার রাহেজা, টি স্টলে যাদের বসে থাকতে দেখেছেন তারা কেউ খারাপ নয়। ওদের খুব কম বয়স থেকেই চিনি। এক পাড়ায় থাকি। একসঙ্গে আমরা বড় হয়ে উঠেছি। আমি যখন আপনাদের হাউসের মাথায় গিয়ে বসলাম, ওরা যেন অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পেল। আমার কাছে ওদের যে কত এক্সপেক্টেশন, ইউ কাঁচ ইমাজিন। ওরা ভেবেছিল আমি পার্মানেন্ট সার্ভিসের ব্যবস্থা করে ওদের হাতে একটা সুস্থ, ভদ্র জীবন তুলে দেব। কিন্তু সাড়ে তিন মাস শিল্পপতির মেক-আপ নিয়ে অফিসে যাচ্ছি, ফিরে আসছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারিনি। তার ফলটা কী হয়েছে?'

কিছু বললেন না রাহেজা, জিজ্ঞাসু চোখে শুধু তাকিয়ে রইলেন।

অশোক বলল, 'ফলটা হল আমার সম্বন্ধে ওদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ, রাগ, অসন্তোষ জমা হয়েছে। সেদিন যে আমাকে মেরে জখম করল, গাড়ি ভাঙল আর আজ যে নোংরা নোংরা গালাগালি দিল— এসবই হল ওদের ডিস-অ্যাপয়েন্টমেন্ট, অ্যাঙ্গার, ডিসট্রেসের এক্সপ্রেশন। আমি কিন্তু কিছু মনে করিনি। এটা বোধহয় আমার প্রাপ্য ছিল। মিস্টার রাহেজা—'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল রাহেজার, 'ইয়েস স্যর—'

'এদের আর এদের মতো আরও অনেকের জন্যে আমাকে কিছু করতেই হবে। বলে চুপচাপ কী ভেবে ফের শুরু করল, 'কতদূর কী পারব জানি না। তবে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।'

অনেকক্ষণ নীরবতা।

লিমুজিন টালিগঞ্জের বাহান্ন পাকের গলি, তস্য গলি পেরিয়ে ট্রাম রাস্তায় চলে এসেছিল, তারপর কখন রেল ব্রিজের কাছে এসে পড়েছে খেয়াল ছিল না অশোকের। দূরমনস্কের মতো জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎ রশেশ অধিকারীর সেই চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য, এতক্ষণ কেন যে এটা তার মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল! ক্ষিপ্র হাতে পকেট থেকে ব্রাউন রঙের খামটা বের করে সেটার মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল।

ধবধবে সাদা কাগজের ওপর মুক্তোর সারির মতো গোটা গোটা অক্ষরে চোদ্দো-পনেরোটা লাইন। মমতাকাকিমা বলেছিল, প্রথম হার্ট-অ্যাটাকটা হবার পর রশেশকাকা যখন সুস্থ, কিন্তু

চরম কিছু ঘটতে পারে এমন এক শঙ্কায় উতলা হয়ে আছে, সেই সময় এটা লেখা। দু'নম্বর অ্যাটকাটার পর শরীরের একটা দিক যখন পক্ষাঘাতে অসাড়, তখন এত সুন্দর গুছিয়ে এটা লেখা আদৌ সম্ভব হতো না। অশোক পড়তে লাগল—

'স্নেহের অশোক,

তুই তো জানিস, আমার হৃদয়স্রষ্টা প্রথম অ্যাটাকে অনেকটা বিকল হয়ে পড়েছিল পাঁচ কি সাড়ে পাঁচ মাস আগে। সেটা ডাক্তার ধরের কৃপায় কোনওরকমে সামলে নেওয়া গিয়েছিল। তবে কেন যেন মনে হচ্ছিল অন্তিম ঘণ্টা বেজে গেছে। সব সময় তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমি নিশ্চিত, শেষের সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

আমি কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার। কত টাকা আর মাইনে পাই! এক নম্বর স্ট্রোকের ধাক্কাটা সামলাতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্ধেকেরও বেশি শেষ। এরপর যদি মারাত্মক কিছু ঘটে তোর কাকিমাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেই দিনটার কথা ভাবলে আমি শিউরে উঠি।

জীবনে কখনও কারও কাছে হাত পাতিনি। কিন্তু সেই আত্মমর্যাদা এবার ধ্বংস হতে চলেছে। সুধীশ মানে আমার ছেলে সবে আইকম পাশ করে কি কম-এ ভর্তি হয়েছে। সেই সঙ্গে টাইপ আর স্টেনোগ্রাফিটা শিখছে। এই কোয়ালিফিকেশনে কোথায় সে চাকরি পাবে?

আমার এই অন্তিম সময়ে বাবা তুই আমার একমাত্র ভরসা। আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী। তাঁর কৃপায় তুই দেশের একজন সেরা শিল্পপতি। আমার কিছু হয়ে গেলে তুই সুধীশের জন্য কিছু করিস। সুধীশ আর তোর কাকিমা অন্নাভাবে যেন শেষ না হয়ে যায়। জীবিত অবস্থায় এটাই আমার প্রথম আর অন্তিম আর্জি।

তোর মঙ্গল হোক। — রমেশ কাকা।'

চিঠিটা পড়া হলে কিছুক্ষণ নিঝুম বসে রইল অশোক। আনমনা চিঠিটা খামে পুরে ধীরে ধীরে ফের পকেটে ঢোকাল।

রমেশ অধিকারীর মতো বড় মাপের একটা মানুষ, যার প্রবল আত্মবিশ্বাস আর আত্মমর্যাদাবোধ, চিরকাল যে অন্যের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়িয়েছে তার কিনা এই হাল! তার কাছে অশোকের ঋণ কি কম? সে স্থির করে ফেলল সুধীশের জন্য তাকে কিছু করতেই হবে। পরক্ষণে খেয়াল হল, সুধীশকে তাদের অঙ্গনটি কোম্পানির কোনও একটাতে জোরজোর করে ঢুকিয়ে দিলে রমেশ, বিল্টুরা কি তাকে ছেড়ে দেবে? একেবারে ছিঁড়ে খাবে।

অশোক মরিয়া হয়ে উঠল। যা হবার হোক, সুধীশের জন্য কিছু করতে পারলে রমেশকাকার কাছে তার ঋণের সামান্য কিছু অন্তত শোধ করা যাবে।

গাড়ি রাসবিহারী ক্রসিংয়ের মুখে পৌঁছে গিয়েছিল। রাহেজা অশোককে পলকহীন লক্ষ করছিলেন। ভয়ে ভয়ে ডাকলেন, 'স্যর—'

রমেশ অধিকারীর চিঠিটা অশোককে এতটাই বিচলিত করে তুলেছিল যে, আশপাশে কেউ যে আছে, খেয়াল ছিল না। চমকে সে রাহেজার দিকে তাকাল, 'কিছু বলবেন?'

'স্যর, তিনটে বেজে গেছে। এখনও আপনার লাঞ্চ হয়নি। একটা কথা বলব?'

'বলুন না—'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে শরীরটা ঠিক নেই। রামে আপনার ওপর অনেক ধকল গেছে। আজ অফিসে তেমন কোনও ইমপর্টান্ট মিটিং বা কনফারেন্স নেই। আপনি পারমিশন দিলে শোফারকে ওল্ড বালিগঞ্জে যেতে বলি। বাড়ি গিয়ে আপনি রেস্ট নিন।'

অশোক আস্তে হাত নাড়ল, 'না না, আমি ঠিক আছি। অফিসেই যাব। শোফারকে বলে দিন—'

ওল্ড বালিগঞ্জে যেতে হলে রাসবিহারী ক্রসিং থেকে ডান পাশে টার্ন নিতে হবে। রাহেজার নির্দেশ মতো শোফার গাড়িটাকে সোজা চৌরঙ্গির দিকে নিয়ে চলল।

॥ ছয় ॥

আজ সেই দিন।

চীনা তরুণীটিকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সে ম্যাসাজ করতে আসবে না।

বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে আসার পর একটা যান্ত্রিক লাইফস্টাইলের ভেতর ঢুকে পড়েছিল অশোক। ম্যাসাজ ছাড়া বাকি সব আজ একরকমই আছে। অন্যদিনের মতো ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে বেড টি এসে গেল।

চা-পর্ব শেষ হলেই বাথরুম। চীনা যুবতীর ম্যাসাজটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই মনটা একটু খুঁতখুঁত করল। কিন্তু তাড়া আছে। আটটার ভেতর তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বজবজ খুব কাছে নয়। সেখানে পৌঁছতে মিনিমাম দু'ঘণ্টা লেগে যাবে। তাই বাথরুমের বাকি কাজগুলো যেমন শেভিং, স্নান-টান চটপট সেরে বেডরুমে এসে পোশাক পাল্টে সোজা ডাইনিং হল-এ।

অশোকের প্রাইভেট সেক্রেটারি চন্দ্রকান্ত রাহেজা ওল্ড বালিগঞ্জের এই বিল্ডিংয়েই থাকেন। কোনও বিশেষ কারণ না থাকলে তাদের দিনের প্রথম দেখাটা হয় ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

রাহেজার পাংচুয়ালিটির তুলনা নেই। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সকাল থেকে প্রায় মাঝরাত অবধি নিজের কাজ করে যান। নিজের কাজ বলতে অশোকের যে সব কর্মসূচি থাকে সেগুলো তাকে মনে করিয়ে দেওয়া। অফিসের বাইরে কোথাও অশোকের যদি কোনও প্রোগ্রাম বা কনফারেন্সে যেতে হয় ছায়ার মতো তার সঙ্গে থাকা।

ডাইনিং হল-এ আসতেই রাহেজাকে দেখতে পেল অশোক। আগে থেকেই এখানে এসে বসে আছেন তিনি।

রাহেজা উঠে দাঁড়ালেন, 'গুড মর্নিং স্যর—'

'গুড মর্নিং। বসুন বসুন—'

দু'জনে বসে পড়ল। ব্রেকফাস্ট সারতে মিনিট কুড়ির বেশি লাগল না। তারপর বিল্ডিংয়ের বাইরে ওরা বেরিয়ে এল।

রাহেজার সব দিকে নজর। কোনও কাজেই এতটুকু খুঁত নেই। কাল রাতেই খুব সম্ভব শোফারকে বলে রেখেছিলেন, আজ কখন কোথায় যেতে হবে। সে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে অপেক্ষা করছে।

সেই যে ক'দিন আগে অশোক টালিগঞ্জে গিয়েছিল তখন থেকে কোথাও যেতে হলে ব্যাকসিটে নিজের পাশে রাহেজাকে বসিয়ে নেয়। আজও তাই হল।

লিমুজিন গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে এল। তারপর কয়েকটা বাঁক ঘুরে ল্যান্সডাউন রোড ধরে ঢাকুরিয়া লেকের পাশ দিয়ে টালিগঞ্জ পুলিসকাঁড়ি।

ড্রাইভারটি তুখোড়। কলকাতা মেট্রোপলিসটা, শুধু কলকাতা কেন, চারপাশের তিরিশ-চল্লিশ মাইলের ভেতর যত গ্রাম আর ছোটখাট, মাঝারি শহর-টহর আছে সব তার হাতের তালুর মতো চেনা। কোথাও যেতে হবে, এটুকু বললেই যথেষ্ট। সে ঠিকঠাক পৌঁছে দেবে।

ব্যাকসিটের আরোহীরা নিচু গলায় কথা বলছিল। হঠাৎ অশোক জিগ্যেস করল, 'আমরা এই যে বজবজে যাচ্ছি, আমাদের নানা কোম্পানির ডিরেক্টররা কি তা জানতে পেরেছেন? বিশেষ করে হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা?'

একটু চুপ করে থেকে রাহেজা বললেন, 'মনে হয় না। তবে—'

'তবে কী?'

'আপনি ওখানে যাবার পর জেনে যেতে পারেন।'

'মানে?'

'প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে বা অফিসে ওঁদের নিজস্ব কিছু লোকজন

আছে। তারাই হয়তো জানিয়ে দেবে।'

অশোক অবাক, 'তার মানে নানা জায়গায় ওঁরা স্পাই রেখে দিয়েছেন—'

রাহেজা বললেন, 'এটা শুধু আমাদের হাউসেই নয়, প্রায় সব বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসেই এই ব্যাপারটা আছে। কেউ স্যাবোটেজ বা কোম্পানিগুলোর স্বার্থ-বিরোধী কিছু করছে কি না, সেই খবরটা অথরিটিকে জানতে হয়। কোম্পানির ক্ষতি হতে পারে এমন সব ইনফরমেশন রাখতেই হয় স্যর। এটা হাস্যাভাবিক নয়—' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'কে বা কারা ক্ষতি করতে চাইছে, আগে থেকে জানতে পারলে স্টেপ নিতে সুবিধা হয়।'

ইন্ডাস্ট্রি-টিভাস্ট্রি চালাতে হলে কত কিছু যে করতে হয় ধারণা ছিল না অশোকের। তার কৌতূহল এবং বিস্ময় বেড়েই যাচ্ছিল। জিগ্যেস করল, 'কী ধরনের স্টেপ?'

'কতটা ড্যামেজ হতে পারে স্টেপটা তার ওপর নির্ভর করে।'

অশোক আর কোনও প্রশ্ন করল না।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর অশোক বলল, 'আপনি যে বললেন, বজবজে এই যে আমরা যাচ্ছি সেই খবরটা হাই পাওয়ার কমিটির মেম্বারদের জানানো হবে কেন? আমি এত বড় হাউসের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর। হাই পাওয়ার কমিটির কি ধারণা আমি কোনও ড্যামেজ করতে বজবজে গেছি?'

একটু ইতস্তত করে রাহেজা বললেন, 'স্যর, আপনি আমাকে বন্ধু বলে মনে করেন। এতে আমি গর্ববোধ করি। এই হাউসে আসার আগে আরও দুটো বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে কিছু দিন কাজ করে এসেছি। আপনার মতো অন্য কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আমাকে এত বড় মর্যাদা দেননি। তাঁরা আমাকে সামান্য একজন কর্মচারী বলেই ভাবতেন। এই হাউসেও সেই একই ব্যাপার। আপনিই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাই আপনাকে সাহস করে বলতে পারি। আসলে আপনি কোনও ট্র্যাডিশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নন। আপনার ক্লাস ক্যারেক্টার আলাদা। একটা বড় মিশন নিয়ে এখানে এসেছেন। কাজটা শেষ করতে পারলেই চলে যাবেন। আমি কি ঠিক বলছি?'

তাঁর শ্রেণী-চরিত্রটা যে কী, চন্দ্রকান্ত রাহেজার মতো শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ যে ধরে ফেলবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। অশোক আস্তে মাথা নাড়ল, 'অবশ্যই ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব এখনও পাইনি।'

রাহেজা কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'উত্তরটা দিলে আর তা যদি জানাজানি হয়ে যায় আমার পক্ষে সেটা খুবই রিস্কি। এই হাউসে চাকরি করা আর সম্ভব হবে না। এখানকার অন্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা এমন হাল করে ছাড়বে যে অন্য কোথাও চাকরি পাব না। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমাকে পথে বসতে হবে।'

অশোকের মনে পড়ল, এইরকম ঝুঁকি আর চাকরি খোয়াবার কথা আগেও দু-একবার বলেছেন চন্দ্রকান্ত রাহেজা। সে তাঁর হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলল, 'মিস্টার রাহেজা, আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আপনি যা বলবেন তা আমি ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারবে না। আই প্রমিস—'

'ঠিক আছে স্যর। উত্তরটা হল, আমাদের হাউসে হাই-পাওয়ার কমিটি ছাড়াও আরও অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন। তাঁদের একজনও আপনাকে বিশ্বাস করেন না। সোমদেব চ্যাটার্জি যে আপনাকে এই হাউসের মাথায় বসিয়ে দিয়ে আপনার একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখতে চান, তাতে ওঁরা বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট নন। কিন্তু কিছুই করার নেই। সোমদেব চ্যাটার্জির বিরাট পার্সোনালিটি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড আর আমাদের এই হাউসের ওপর তাঁর প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্স। এই হাউসের দায়িত্ব নেবার পর এর এক্সপ্যানসন

হয়েছে অনেক। নতুন নতুন ইন্ডাষ্ট্রি হয়েছে। বিজনেস বেড়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। আমাদের কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। তাঁর মুখের ওপর কথা বলবে কে? কিন্তু—'

'কিন্তু কী।'

'আমাদের হাউসের ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টরা একজনও আপনাকে বিশ্বাস করেন না। কারণ আপনি সোসাইটির যে লেভেল থেকে এসেছেন আর এঁরা যে লেভেলের মানুষ তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এঁরা আপনাকে শুধু সন্দেহই করেন না, প্রতিটি মুহূর্তে আপনার মুভমেন্টের ওপর নজর রাখেন। কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন, কী বলছেন, সব খবর এঁদের কাছে পৌঁছে যায়।'

'তা-ই?'

রাহেজা হাসলেন, 'একটা কথা শুনলে আপনি খুব অবাক হবেন সার। হয়তো দুঃখও পাবেন।'

'কী কথা?' অশোকের চোখে-মুখে একই সঙ্গে কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা।

'আপনি সারাদিনে কোথায় কোথায় যান, 'কী করেন, মিস্টার সোমদেব চ্যাটার্জিও তা জানেন।'

'কী বলছেন আপনি!' অশোক চমকে উঠল, উনিও কি আমার পেছনে স্পাই লাগিয়ে দিয়েছেন?'

রাহেজা বললেন, 'তা বলতে পারব না। তবে আমাদের হাউসের যুক্ত সমস্ত কিছু ইনফরমেশন ওঁর কাছে চলে যায়। কীভাবে যায়, কারা তাঁর কাছে পাঠায়, তা বলতে পারব না।'

কিছুক্ষণ রাহেজার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অশোক। তারপর বলে, 'উনি আমাকে এই হাউসে নিয়ে এসে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি এবার চলে যাচ্ছি। ইন ফ্যাক্ট তোমাকে একটা ব্যাটল ফিল্ডে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলাম। এই যুদ্ধে তুমি জিতবে না হারবে, দূর থেকে আমি তা দেখব। একজন ডিসপ্যাশনেট দর্শক ছাড়া আমার আর ভূমিকা নেই। যিনি এমন সব কথা বলেছিলেন, তিনি কেন আমি কী করছি না-করছি সেসব সম্বন্ধে ইনফরমেশন নিতে যাবেন? ব্যাপারটা অ্যাবসার্ড নয়?'

রাহেজার মুখমণ্ডলে খুব ধীরে ধীরে রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল।

অশোক জিগ্যেস করল, 'হাসছেন যে?'

'স্যর, আমি যা বলেছি সেটা অ্যাবসার্ড নয়, কোয়াইট ন্যাচারাল।'

'কীরকম?'

'মিস্টার সোমদেব চ্যাটার্জি প্রায় একাই এত বড় একটা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এম্পায়ারের অনেকটা গড়ে তুলেছেন। তিনি কি তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্তটা আপনার মতো বাইরের কারও হাতে তুলে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবেন? এই হাউসের সঙ্গে তাঁর নিজের তো বটেই, তাঁর শ্রেণীস্বার্থও জড়িয়ে আছে। সে সব ধ্বংস হতে দেবেন?'

বিদ্যুৎচমকের মতো অশোকের মনে পড়ে গেল, এ জাতীয় কিছু কিছু কথা খুব সম্ভব সোমদেব চ্যাটার্জি তাকে বলেছিলেন। তা ছাড়া কম্পিউটার বসানোর উদ্যোগ কৌশলে থামিয়ে দিয়ে কিছু দিন আগে শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে এই ব্যাপারটা অশোকের কাছে খোলসা হয়ে যায়।

সোমদেব চ্যাটার্জিকে কেন যে বারবার একজন নিস্পৃহ, অন-লুকার ভাবে অশোক? তিনিই তো আসল রাইভাল। কেন যে এটা সে বারবার ভুলে যায়! সোমদেব চ্যাটার্জি তাকে স্টেজে তুলে বাঁদর নাচ নাচবে, তা হতে দেওয়া যায় না।

অশোকের একটা হাত রাহেজার হাতের ওপর পড়ে ছিল। একটু চাপ দিয়ে সে হাসল, 'মিস্টার রাহেজা, আপনি ঠিকই বলেছেন। সোমদেব চ্যাটার্জি আর হাউসের অন্য ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টরা তাঁদের কাজটা করেন। যে পারপাস নিয়ে আমি এখানে এসেছি সেখান থেকে কিছুতেই পিছু হটব না। যদি কখনও কিছু দরকার পড়ে নিজেকে আর নিজের ফ্যামিলিকে বাঁচিয়ে আপনি কি সাহায্য করবেন?'

এমন দুঃসাহসী, নিঃস্বার্থ মানুষ আগে আর কখনও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডে দেখেননি চন্দ্রকান্ত রাহেজা। আন্তরিক গলায় বললেন, 'নিশ্চয়ই করব।'

'ধন্যবাদ। বজবজ আর কত দূর?'

এতক্ষণ দু'জনে কথাই বলে যাচ্ছিল। কলকাতা থেকে তারা কোথায় চলে এসেছে, খেয়াল ছিল না। ব্যস্তভাবে রাহেজা জানলার বাইরে মুখ বাড়ালেন। বললেন, 'আমরা প্রায় এসে গেছি। আর বেশিক্ষণ লাগবে না।'

এক সময় অশোকদের লিমুজিন বিশাল একটা কারখানার সামনে এসে দাঁড়াল। মস্ত গেটের পাশে লম্বা-চওড়া তাগড়াই চৌগাঁফাওয়ালা ভোজপুরি দারোয়ান, হাতে বন্দুক, দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের মাথায় বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা: 'জেনিথ স্টিল কোম্পানি'।

গেটটা আধাআধি খোলা। দারোয়ান অশোককে দেখতে পেয়ে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে টানটান দাঁড়িয়ে লম্বা একটা স্যালুট করে ক্ষিপ্র হাতে গেটটা পুরোপুরি খুলে দিল।

লিমুজিন ভেতরে ঢুকে একধারে দাঁড়িয়েও পড়ল। দারোয়ান দৌড়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

গেটের পর অনেকটা এলাকা ফাঁকা। সেখানে ল্যান্ড-স্কেপড গার্ডেন, ফোয়ারা, সুরকি-বিছানো রাস্তা। সেসবের ওধারে ফ্যাক্টরির বিশাল শেড। শুধু একটাই নয়, পরপর চারটে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে অশোকের মনে হল জায়গাটা তার চেনাচেনা। আগেও খুব সম্ভব এখানে এসেছিল সে। চকিতে খেয়াল হল সোমদেব চ্যাটার্জি এই হাউসে তাকে নিয়ে আসার পর নানা কলকারখানায় তার সংবর্ধনার বন্দোবস্ত করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত কর্মীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

সোমদেবদের কলকারখানা শুধু বজবজেই নেই, বিটি রোডের ধারে, নৈহাটি, শ্যামপুর, জগদ্দল এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নানা এলাকায়। তাছাড়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের শহরগুলোর পাশে। অশোক শুনেছে, বেঙ্গলের বাইরেও কয়েকটা প্রভিন্সেও এই হাউসের আরও অনেক কারখানা রয়েছে।

সব জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সোমদেব চ্যাটার্জি বলেছিলেন, পরে হাউসের অন্য ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টরা তাকে বাকি কারখানাগুলোতে নিয়ে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সংবর্ধনার বন্দোবস্ত করবেন।

মাত্র সাড়ে তিন মাস অশোক এই হাউসে এসেছে। তার মধ্যে বেশ কিছুদিন মারাত্মক জখম হয়ে তাকে নার্সিংহোমে কাটাতে হয়েছে। সময় আর কতটুকুই বা পেয়েছে। এর ভেতর কলকাতার চারপাশে কয়েকটা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গিয়ে সোমদেব তার রিসেপশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরপর কয়েকদিন এত কারখানায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে, কোথায় কোথায় সে গেছে, ঠিকমতো মনে করে রাখতে পারে না। স্মৃতির ভেতর সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

জেনিথ স্টিল কোম্পানির কম্পাউন্ডে ঢোকার পর মনে পড়ল গেটের সামনের মস্ত ফাঁকা এলাকাটায় বিশাল শামিয়ানা খাটিয়ে তাকে রিসেপশন দেওয়া হয়েছিল। তখন গেটের ভোজপুরি দারোয়ানটা তাকে শুধু দেখেইনি, মনে করে রেখেছে, স্যালুটের বহর দেখে তা বোঝা যায়।

অশোককরা গাড়ি থেকে নেমে গার্ডেনের কাছাকাছি চলে এসেছিল। তাদের আসার খবরটা কারখানার ভেতর ছড়িয়ে

পড়েছে। ফ্যাক্টরির ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্য অফিসাররা ছুটতে ছুটতে চলে এসেছেন। আর 'জেনিথ স্টিল'-এর ওয়ার্কাররা কাজকর্ম ফেলে কারখানার চারটে শেড থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এসেছে।

অশোকের চোখে পড়ল, 'জেনিথ স্টিল'-এর চারটে শেডের পেছন দিকে আরও অগুনতি শেড এবং লম্বা লম্বা চিমনি আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। চিমনিগুলোর মুখ দিয়ে অনর্গল গাঢ় কালো ধোঁয়া বেরচ্ছে।

অশোক জিগ্যেস করল, 'মিস্টার রাহেজা, অনেক দূর পর্যন্ত প্রচুর শেড আর চিমনি দেখতে পাচ্ছি। এখানে কি জেনিথ স্টিল ছাড়া অন্য কোনও ফ্যাক্টরি আছে?'

রাহেজা বললেন, 'স্যর, এখান থেকে গঙ্গা পর্যন্ত পাঁচ মাইল এরিয়াটা আমাদের হাউসের। এখানে শুধু স্টিল ফ্যাক্টরিই নয়, ইন্ডিয়া কেমিক্যালের ফ্যাক্টরিও আছে। আর আছে জুটমিল, নানা টাইপের সাবান তৈরির কারখানা। আছে সাইকেল, মোটর আর ট্রাকের টায়ার তৈরির ফ্যাক্টরি। আর গঙ্গার ধার ঘেঁষে শিপ রিপেয়ারিং-এর ইয়ার্ড। উঁচু উঁচু দেওয়াল তুলে প্রত্যেকটা কারখানার জন্য আলাদা আলাদা কম্পাউন্ড।'

'জেনিথ স্টিল'-এর ম্যানেজার এবং অন্য অফিসাররা অশোকের খুব কাছে চলে এসেছিলেন। মুখ চেনা কিন্তু ম্যানেজারের নামটা জানা নেই।

রাহেজা এই হাউসের হেড অফিস আর সমস্ত ফ্যাক্টরির ম্যানেজার এবং টপ অফিসারদের চেনেন, নামও জানেন। জেনিথ স্টিলের ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে অশোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ম্যানেজারের নাম দেবশঙ্কর সরকার। তিনি হাতজোড় করে বিগলিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি আসবেন, ভাবতেও পারিনি। আমাদের কী সৌভাগ্য। আসুন স্যর, আসুন—'

অন্য অফিসার বা ইঞ্জিনিয়ারদের নামগুলোও নামতা পড়ার মতো গড় গড় করে বলে গিয়েছিলেন রাহেজা, কিন্তু দেবশঙ্কর ছাড়া আর একটা নামও অশোক মনে করে রাখেনি।

অন্য অফিসার আর ইঞ্জিনিয়াররা তাকে অফিস ঘরে নিয়ে যাবার জন্য প্রায় কাকুতি-মিনতি করছেন, কিন্তু সেসব যেন শুনতে পাচ্ছে না অশোক। কারখানার যে ওয়ার্কাররা ভিড় জমিয়েছে, তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

ডেপুটি ম্যানেজার এবং দু-চারজন অফিসার শ্রমিকদের ধমক-ধামক দিচ্ছিলেন, 'কেন এখানে জটলা করছেন? স্যরকে বিরক্ত করবেন না। ফ্যাক্টরিতে ফিরে গিয়ে নিজেদের ডিউটি করুন।'

কারও নড়ার লক্ষণ নেই। বরং ভিড় বেড়েই চলেছে। কেউ চুপ করে নেই। হইচই চলছেই।

ম্যানেজার দেবশঙ্কর সরকার থামছেনই না, বলেই চলেছেন, 'স্যর, এত ভিড় আর চেঁচামেচির মধ্যে আপনার কষ্ট হচ্ছে। দয়া করে অফিসে চলুন—'

জনতার দিকে চোখ রেখেই অশোক বলল, 'অফিসে বসার জন্যে এখানে আসিনি। — মিস্টার রাহেজা, সেদিন হেড অফিসের সামনে রাস্তা আটকে যারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল, তাদের কাউকে কি দেখতে পাচ্ছেন? বিশেষ করে সেই লম্বা, রোগাটে লোকটাকে?'

'না স্যর—' রাহেজা মাথা নাড়ল।

ম্যানেজার গরুড় পক্ষীর মতো হাতজোড় করে অশোকের দিকে তাকিয়ে তো আছেনই, কানও খাড়া করে রেখেছেন। অনন্ত কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'স্যর, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

এতক্ষণে দেবশঙ্কর সরকারের দিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করল অশোক। ম্যানেজার সেই লোকটাকে জানলেও জানতে পারে। বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু নামটা জানি না। আমাদের 'জেনিথ স্টিল' বা 'ইন্ডিয়া কেমিকেল' ফ্যাক্টরির একজন ওয়ার্কার। তার চেহারার বর্ণনাও দিল।

ম্যানেজার কিছুক্ষণ ভেবে খুব বিনীতভাবে বলল, 'ওইরকম চেহারার অনেক লেবারার আমাদের এখানে কাজ করে। নামটা না জানলে—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই জনতার মধ্যে হঠাৎ আলোড়ন শুরু হল। হইচইয়ের মাত্রাটাও অনেকটাই বেড়ে গেছে।

অশোকের চোখ ফের জনতার দিকে ফিরে গেল। অবাক হয়ে দেখল, যে ঢ্যাঙা, ক্ষয়াটে, আধাবয়সি লোকটাকে সে খুঁজছে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ঠেলে, গুঁতিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

রাহেজা প্রবল উৎসাহে উঁচু গলায় বলে উঠলেন, 'ওই তো সেই লেবারটা—'

অশোক সামান্য হাসল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত লোকটার দর্শন পাওয়া গেল।'

ম্যানেজার হতবাক। বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের সর্বেসর্বা, সারা দেশের একজন টপমোস্ট শিল্পপতি সকালবেলা কলকাতা থেকে এতদূরে নগণ্য একটা ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ভাবা যায়!

লোকটা সঙ্গীদের নিয়ে অশোকের সামনে এসে হাতজোড় করে, সেদিনের মতো শরীর অনেকটা ঝুঁকিয়ে বলল, 'পন্নাম বড় সায়েব, পন্নাম—'

অশোক তার দু'কাঁধ ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। 'আপনি তো খুব বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন—'

ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে লোকটা বলল, 'কেন বড় সায়েব, আমার কি কোনও অপরাধ হয়েছে?'

'না না, আপনার নামটাই তো সেদিন বলেননি। কার সঙ্গে দেখা করব, এখানে আসার পর তাই কাউকে বলতে পারছিলাম না।'

'আমার নাম তারাপদ সামন্ত। আপনাদের তুচ্ছ একজন লেবার।'

'আমি যে এখানে আসব, সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন তো?'

ঘাড় নামিয়ে ত্রস্ত ভঙ্গিতে তারাপদ বলল, 'না বড় সায়েব—'

'কেন?'

'আপনি যদি—' বাকিটা শেষ না করে থেমে গেল তারাপদ।

অশোকের কপাল কুঁচকে গেল। অসন্তুষ্ট, বিরক্ত গলায় বলল, 'আমি যদি না আসি— তাই তো?'

তারাপদর মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল। উত্তর দিতে সাহস হল না তার।

অশোক তারাপদর কাঁধে একটা হাত রাখল; 'আপনি আর আপনার সেদিনের সঙ্গীরা কী ভেবেছিলেন, কথা দিয়ে আমি কথা রাখব না— সবটাই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি?'

ম্যানেজার দেবশঙ্কর সরকার এবং অন্য অফিসারদের চোখ গোলাকার হয়ে গেছে। হাউসের টপমোস্ট ব্যক্তিটি একজন কালিঝুলি মাখা লেবারারের কাঁধে হাত রেখে সমকক্ষের মতো কথা বলছেন। কী দেখছেন তাঁরা! পুরোপুরি অবিশ্বাস্য, কাল্পনিক কোনও দৃশ্য!

তারাপদ ঢোক গিলতে গিলতে বলছিল, 'ক্ষমা করবেন বড় সায়েব, কখনও মনে হচ্ছিল আসবেন, আবার ভাবছিলাম, আপনার মাথায় অনেকগুলো, কলকারখানা, হাজার হাজার লেবার, তার ওপর কত কাজের চাপ, হয়তো আসতে পারবেন না। তাই—'

অশোক হাসল, 'বুঝেছি। যে কারণে আমার বজবজে আসা, এবার সেখানে নিয়ে চলুন।' কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন 'জেনিথ স্টিল'-এর ম্যানেজার। তাঁকে বলল, 'আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে মিস্টার সরকার। ঘণ্টাদুয়েকের জন্যে আপনার ওয়ার্কারদের ছুটি দিন। ওরা আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চায়।

সেখানকার কাজটা হয়ে গেলে ফিরে এসে ডিউটি দেবে—'

ম্যানেজার বললেন, 'আপনি বলেছেন, তার ওপর এই হাউসে অন্য কারও কথা বলার সাহস আছে?'

'আমাদের হাউসে সব ব্যাপারেই নিয়ম আর ডিসিপ্লিন আছে। আপনার পারমিশন ছাড়া ডিউটি আওয়ার্সে কোনও এমপ্লয়ি বেরুতে পারবে না। কারণ আপনার আন্ডারে এরা কাজ করে। তাই আপনার পারমিশনটা চাই—'

'স্যর, আপনার যখন ইচ্ছে ওয়ার্কাররা দু'ঘণ্টা কেন, বাকি দিনটাই ছুটি নিতে পারে।'

'থ্যাংক ইউ। চলুন তারাপদবাবু—'

ম্যানেজার হঠাৎ যেন ধন্দে পড়ে গেলেন, 'ওদের সঙ্গে কোথায় যাবেন স্যর?'

অশোক বলল, 'ওরা যেখানে থাকে—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল জেনিথ স্টিল কোম্পানির শেডগুলোর আড়াল থেকে ভিড়ের ভেতর দিয়ে দামি দামি স্যুট-বুট পরা দশ-বারোজন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে আসছেন। দেখামাত্র বোঝা যায় এঁরা উঁচু গ্রেডের অফিসার।

অশোক দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেই রিসেপশনের দিন একবারই মাত্র এখানে এসেছিল। সেদিন কি এঁদের দেখেছিল? মনে করতে পারল না।

ওলিম্পিকসে যে চারশো কি আটশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা হয় অনেকটা সেই কায়দায় ওই দশ-বারোজন হাঁফাতে হাঁফাতে অশোকের সামনে চলে এল। বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় একটা বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'আভূমিপ্রণত', অনেকটা সেই ভঙ্গিতে ওঁরা তার পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বিব্রত অশোক প্রায় লাফ দিয়ে কয়েক স্টেপ পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'এ কী! এ কী! আপনারা কারা?'

পরিচয়টা অবশ্য করিয়ে দিলেন দেবশঙ্কর সরকার। গোলগাল মেদের পাহাড়ের মতো যাঁর আকৃতি তিনি হলেন নবগোপাল ঘোষাল, জুট মিলের ম্যানেজার। ছিপছিপে ঝকঝকে চেহারার বিনায়ক দত্ত টায়ার ফ্যাক্টরির ম্যানেজার। বাকি সবাই দুই বিশাল কারখানার বড় মাপের অফিসার।

জুট মিলের গোলাকার ম্যানেজার নবগোপাল ঘোষাল কুকুরের মতো প্রায় আধ-হাত জিব বের করে হাঁই হাঁই করে হাঁফিয়েই যাচ্ছিল। বলল, 'স্যর, আপনি এসেছেন। খবরটা পেয়েই আমরা চলে এসেছি। দয়া করে আমাদের ওখানে একবার চলুন—'

টায়ার ফ্যাক্টরির ম্যানেজার এবং অফিসারদেরও একই আর্জি। কে কত তোষামুদি করে অশোককে কত বেশি খুশি করতে পারে তারই এক সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা যেন চলতে লাগল।

অশোক নিচুগলায় রাহেজাকে জিগ্যেস করল, 'তারাপদ সামন্ত যেখানে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে সেখানে বজবজে আমাদের যেসব ফ্যাক্টরি আছে সেগুলোর সমস্ত লেবারার কি থাকে?'

রাহেজা তাঁদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের নাড়িনক্ষত্রের খবর জানেন। বললেন, 'না স্যর। 'জেনিথ স্টিল', 'ইন্ডিয়া কেমিকেল' আর জুট মিলের লেবাররারা ওখানে থাকে।'

'এখানে তো টায়ার ফ্যাক্টরি, সোপ ফ্যাক্টরি, এমন আরও কয়েকটা ফ্যাক্টরি রয়েছে। সেগুলোর ওয়ার্কাররা কোথায় থাকে?'

রাহেজা বুঝিয়ে দিলেন, 'ফর্টি সেভেনের আগে ইংরেজরা জুট মিল, জেনিথ স্টিল আর ইন্ডিয়া কেমিকেলের তিনটে কারখানা এখানে বসিয়েছিল। তারাই লেবাররাদের থাকার জন্যে রাস্তার ওধারে কোয়ার্টার বানিয়েছিল। বেশির ভাগ ওয়ার্কাররাই সেখানে থাকত। এখনও থাকে। বাকিরা নিজেদের বাড়ি থেকে ডিউটি দিতে আসে। দেশ স্বাধীন হবার পর এই তিন ফ্যাক্টরির মালিকানা বদলে যায়। আমাদের হাউস ইংরেজদের কাছ থেকে ওগুলো কিনে নেয়। পরে এখানে আরও কয়েকটা নতুন কারখানা বসানো হয়। সেগুলোর লেবাররাদের জন্যে আমাদের হাউস কোয়ার্টার বানায়নি। তারা চারপাশে বাড়ি ভাড়া-টাড়া করে থাকে।'

অশোক এবার ছুট, হিল আর কেমিকেলের তিন ম্যানেজার দেবশঙ্কর সরকার, নবগোপাল ঘোষাল আর বিনায়ক দত্তকে কাছে ডেকে নিল। দেবশঙ্করকে বলল, 'একটু আগে আপনাকে দু'ঘণ্টার জন্যে ফ্যাক্টরি ছুটি দিতে বলেছিলাম। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। প্রোডাকশন বন্ধ হলে হাউসের ক্ষতি।' নবগোপালদের বলল, 'মনে হচ্ছে আপনাদের ফ্যাক্টরিগুলোর ওয়ার্কাররাও সব বেরিয়ে এসেছে। তাদের ফিরে গিয়ে ডিউটি শুরু করতে বলুন। আপনারা তিন ম্যানেজার শুধু আমার সঙ্গে যাবেন। মিস্টার রাহেজা তো আছেনই। তারাপদ মণ্ডল আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।'

এই বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের সর্বেসর্বা হঠাৎ সকালবেলায় কেন চলে এসেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যটা কী, তারাপদর মতো একটা সামান্য ওয়ার্কারের সঙ্গে কোথায় যাবেন, এসব জানার জন্য অপার কৌতূহল ছিল কয়েক হাজার ওয়ার্কারের। কিন্তু মুখ ফুটে তা তো বলা যায় না। অনেকটা হতাশা নিয়ে তারা তাদের কাজের জায়গায় ফিরে গেল।

অশোক বলল, 'এবার তা হলে যাওয়া যাক।'

'জেনিথ স্টিল'-এর গেট পেরিয়ে রাস্তার ওপারে যেতে যেতে তারাপদ বলল, 'বড়সাহেব, আপনাকে কিন্তু অনেকটা হাঁটতে হবে। আর মাইলটাক—'

'ঠিক আছে, অসুবিধা নেই।'

প্রথম দিকে রয়েছে অশোক, রাহেজা এবং তারাপদ। তারাপদই গাইড। তাদের পেছনে তিন ম্যানেজার। খুব সম্ভব তাঁদের হাঁটার তেমন অভ্যাস নেই। বিশেষ করে নবগোপাল ঘোষালের। প্রায় আড়াই মণ ওজনের বিশাল শরীর টানতে টানতে কোনওরকমে এলোমেলো পা ফেলছিলেন। যে কোনও মুহূর্তে লাট খেয়ে পড়ে যেতে পারেন। অশোকের কানে যাতে না যায় এমনভাবে গলা নামিয়ে বললেন, 'লাইফে এত হাঁটা কখনও হাঁটিনি। হার্টফেল করে যাবে। এর আগে চার-পাঁচটা বড় কোম্পানিতে কাজ করেছি কিন্তু এমন চেয়ারম্যান লাইফে আর কখনও দেখিনি—'

দেবশঙ্কর সরকার বললেন, 'তারাপদর মতো একটা থার্ড ক্লাস লেবাররের কথায় নেচে আমাদের যে কোথায় নিয়ে চলল—'

বিনায়ক দত্ত বললেন, 'আস্তে আস্তে। আরও গলা নামান। শুনতে পাবেন।'

দেবশঙ্কর কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামালেন, 'শুনেছি, ইনি বেকারদের এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করে সোশ্যাল প্যাটার্ন পাল্টে দেবেন। কলকাতায় বসে যত পারিস তার মাস্টারপ্ল্যান কর না। হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আমাদের লাইফ হেল করে দেওয়ার মানে হয়? হেঁটে হাটু আর কোমরের বারোটা বেজে গেল—'

গলা যতই নামাক, অশোক শুনতে পেয়েছিল। ঘাড় ফিরিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, 'আপনাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পারছি। তবে এর বিকল্প দরকার আছে। আর মাস্টারপ্ল্যানের কথা বললেন না? কলকাতায় বসে তা করা সম্ভব নয়। এখান থেকে আর এই রকম নানা জায়গা থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে না পারলে প্ল্যানটা করা যাবে না।'

তিন ম্যানেজার আতঙ্কে একেবারে চুপসে গেছেন। তাঁদের দম-আটকানো গলার ভেতর থেকে শুধু একটাই শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল, 'স্যর—স্যর—স্যর—'

অশোক বলল, 'ভয় নেই। আমার এই টাইপের কমেন্ট শোনার অভ্যাস আছে। আপনাদের সারভিসের কোনওরকম ড্যামেজ হবে না। আই অ্যাশিওর ইউ।'

তিন ম্যানেজারের মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছিল। কেউ আর টুঁ শব্দটিও করল না।

মিনিট কুড়ি-বাইশ হাঁটার পর একটা মস্ত এলাকায় এসে পড়ল

অশোকরা। এখানে লম্বা লম্বা টানা ব্যারাক টাইপের আদ্যিকালের অঙ্গুনতি বাড়ি। সেগুলোর মাথায় ভাঙাচোরা টালির চাল। রোদ-বৃষ্টি ঠেকাতে তেরপল কি প্যাকিং বক্সের কাঠের তাপ্পি মারা। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে ভেতর থেকে নোনা-ধরা ইট বেরিয়ে পড়েছে। দুটো করে ঘরের দু'ধারে কোমর সমান হাইটের দেওয়াল। ঘর দুটোর সামনে এক সময় সিমেন্টের বারান্দা হয়াতো ছিল। সিমেন্টের আস্তর কবেই চটে গিয়ে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে। তারই একধারে পুরনো জং-ধরা টিন দিয়ে ঘিরে রান্নার ব্যবস্থা।

রাস্তার দিক থেকে বহু দূর অবধি পরপর কত যে ব্যারাক তার লেখাজোখা নেই।

রাস্তার দিকের প্রথম ব্যারাকটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তারাপদ। তার দেখাদেখি বাকি সবাই।

তারাপদ বলল, 'বড়সায়েব এই যে লম্বা লম্বা বাড়িগুলোন দেখছেন এগুলো আমাদের কোয়ার্টার। কোম্পানি ফি ফেমিলিকে দু'খানা করে ঘর দিয়েচে। পর পর লম্বা লম্বা যত বাড়ি চোখে পড়চে তাতে আমরা স্টিল ফ্যাক্টরি, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি আর জুটের কারখানার লেবারদের বউ ছেলেপুলে নিয়ে থাকি।'

এই রকমই আন্দাজ করেছিল অশোক। প্রথম ব্যারাকটার সামনে ময়লা জামা আর ইজের পরা প্রচুর বাচ্চা-কাচ্চা কিলবিল করছে। দু'কামরার কোয়ার্টারের সামনের বারান্দার ঘেরা জায়গায় কয়লার উনুনে ঠুং ঠাং আওয়াজ করে রান্না করছে মাঝবয়সি কি অল্পবয়সি রোগাটে চেহারার বউরা। বারান্দার খোলা জায়গায় বসে আছে বুড়ো-ধুড়ো কিছু মানুষ। প্রায় দুপুর হয়ে আসা এই সময়ে ফ্যামিলির শক্ত-সমর্থ পুরুষরা কেউ নেই, তারা নিশ্চয়ই কলে কাজ করতে চলে গেছে।

চারপাশ থেকে বোটকা, উৎকট দুর্গন্ধ উঠে আসছে। কীসের গন্ধ কে জানে।

তারাপদ বলল, 'বড়সায়েব, রাস্তার দিকের এই কোয়ার্টারগুলোনে কোনও রকমে মাথা গুঁজে আমাদের মতো লেবাররা থাকতে পারি। কিন্তু পেছন দিকের কোয়ার্টারগুলোনের হাল দেখলে—' বাকিটা শেষ না করে থেমে গেল।

তারাপদ কী চাইছে বুঝতে পারছিল অশোক। তার ইচ্ছা পেছন দিকের ব্যারাকগুলোও সে দেখুক।

অশোক বলল, 'এতদূর যখন এসেছি, যতটা পারি দেখে যাব।'

তারাপদ অশোকদের ঠিক পরের ব্যারাক বাড়িটার কাছে নিয়ে এল। দুটো ব্যারাকের মধ্যে চলাচলের জন্য দশ ফিটের মতো চওড়া প্যাসেজ। প্যাসেজটা শুধু হাঁটা-চলার জন্যই নয়, এখানে ওখানে গু, মূত্র, কফ, পোড়া বিড়ির অজস্র টুকরো, আনাজের খোসা ছাড়াও নানা ধরনের আবর্জনা।

যে বোটকা গন্ধটা আগে নাকে এসেছিল, এখানে সেটা আরও উগ্র। অশোক লক্ষ করল তার সঙ্গী তিন ম্যানেজার আর রাহেজা নাকের ওপর রুমাল ঠেসে ধরে রেখেছেন। নাক জ্বলে যাচ্ছিল, অশোকও পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপা দিল।

এই ব্যারাকটার ঘরগুলোর বেশিরভাগ দেওয়ালের পলেস্তারাই খসেনি, ভেতরকার ইট ভেঙে ভেঙে বড় বড় গর্ত। গর্তগুলোতে ন্যাকড়া কি পুরনো খবরের কাগজ গোঁজা। মাথার উপর এখানেও টালির চাল। টালিগুলোর কোনওটাই বোধহয় আস্ত নেই। তাই সেগুলোর উপর তেরপলের পটি।

এখানকার দৃশ্যগুলো আগের ব্যারাকটার মতোই। একপাল বাচ্চা প্যাসেজের মল-মূত্র, আবর্জনার ওপর হুটোপাটি করছে। প্রতিটি কোয়ার্টারে রান্নাবান্না চলছে। কোথাও কোমর বেঁধে নানা বয়সের মেয়ে মানুষরা তুমুল ঝগড়াঝাটি চালাচ্ছে। অশোকদের দেখে তাদের কোন্দল আর বাচ্চাদের হুল্লোড় থেমে গেল।

দূরে একটা টিউবওয়েল চোখে পড়ছে। সেখানে বড় বড়

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে
ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতি
ডোমজুড়, হাওড়া
ডোমজুড়ের সমস্ত অধিবাসীদের
শারদীয়া ও দীপাবলির
প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
সৌজন্যে: ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতি
ডোমজুড়, হাওড়া
Ran Agencies

বালতি হাতে বেশ কিছু মেয়েমানুষের ভিড়। টিউবওয়েলটার গা ঘেঁষে সারি সারি ক'টা খুপরিমতো; আব্রু বাঁচানোর জন্য সেগুলোর সামনে পুরনো চটের ছেঁড়া-খোঁড়া পর্দা ঝোলানো।

কয়েকটা ঘরের সামনের বারান্দায় ভাঙাচোরা চেহারার বুড়ো বসে ছিল। অশোক তাদের কাছে গিয়ে বলল, 'আপনারা এখানে কতদিন আছেন?'

অশোকরা যে খুব উঁচুদরের মানুষ, তাদের পোশাক-আশাক দেখে সেটা টের পেয়েছে বয়স্ক লোকগুলো। তারা বারান্দা থেকে নেমে অশোকদের কাছে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। একজন বলল, 'অনেক বচ্ছর সায়েব।'

'আপনাদের এখানে কী কী অসুবিধা হচ্ছে?'

বৃদ্ধরা জানিয়ে দিল, কোয়ার্টারে জলের খুব কষ্ট। প্রত্যেকটা ব্যারাক বাড়িতে একটা মাত্র টিউবওয়েল। তাও অনেক সময় খারাপ হয়ে থাকে। তখন মেয়েদের রাস্তার কল থেকে জল টেনে আনতে হয়। কাছাকাছি ডাক্তারখানা নেই, রোগ-ব্যধি হলে অনেক দূরে যেতে হয়। বাচ্চাদের জন্য স্কুল নেই। শীতকালে ভাঙা চাল আর দেওয়ালের ফোকর দিয়ে হু হু করে কনকনে হাওয়া ঢোকে, বর্ষায় ঢোকে জল। বড্ড কষ্ট। বড্ড কষ্ট। নোংরা ময়লা সাফ করার ব্যবস্থা নেই। আবর্জনা ডাই হয়ে থাকে।

অশোক আস্তে মাথা নাড়ল, 'সত্যিই কষ্ট।'

'আমাদের জন্যি কিছু কি করা যায়?'

'চেষ্টা করব।'

বুড়ো মানুষগুলোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অশোকরা এগিয়ে যায়।

রাহেজা বললেন, 'স্যর, এখানে ভীষণ পলিউশন। বাতাসে মনে হয় সব রোগের ব্যাকটেরিয়া ভেসে বেড়াচ্ছে। মোস্ট অ্যান-হাইজিনিক এনভায়রনমেন্ট। স্যর, এই নোংরা জায়গায় আপনার আর থাকা ঠিক হবে না।'

একটু হাসিই পেল অশোকের। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, কর্পোরেশনের মাপা জলের সাপ্লাই মাঝে মাঝে থেমে যাওয়া—এমন সব ব্যাপারে টালিগঞ্জে মাঙ্গিরাম লাখোটিয়ার সেই বস্তি এই ব্যারাকগুলোর মতো অতটা না হলেও তার কাছাকাছি। সে যে ঘরটায় থাকে তার পাশ দিয়ে একটা চওড়া কাঁচা নর্দমা চলে গেছে। চারপাশের মল, মূত্র, কফ, থুতু এবং অন্য সব পচা আবর্জনা জমা হয়ে থকথকে কাদার মতো চিরস্থায়ী নালার মতো হয়ে আছে। নর্দমাটা হল যাবতীয় রোগব্যাধির জীবাণুর মেটারনিটি হোম। বারো মাস দিন-রাত ওই নর্দমা থেকে যে সুরভি উঠে আসে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে অশোক। শুধু সুরভিই নয়, লক্ষ কোটি ব্যাকটেরিয়াও চলে আসে। এদের মধ্যে বছরের পর বছর কাটিয়েও একান পর্যন্ত অশোক তেমন কোনও বেয়াড়া অসুখ-বিসুখে দু-চারদিনের জন্যও কাত হয়ে পড়েনি। ভেতরে ভেতরে একটা শক্ত বর্মের মতো ইমিউনিটি তৈরি হয়ে গেছে।

কিন্তু সাড়ে তিনটে মাস একটা টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের অঢেল আরাম, বিপুল বিলাসে থেকে আচমকা বজবজের এই পরিবেশে এসে তার যেন একটু অস্বস্তিই হচ্ছে।

অশোক তারাপদকে জিগ্যেস করল, 'আপনারাদের এখানে লেবারারদের জন্যে তত ব্যারাক বাড়ি আছে, সবই খুব সম্ভব একই রকম। তাই তো?'

'আজ্ঞা বড়সায়েব—'

'তা হলে সেসব জায়গায় যাবার আর দরকার নেই। আপনারা কী অবস্থায় আছেন বুঝে গেছি।' বলে রাহেজা আর তিন ম্যানেজারের দিকে তাকাল অশোক। চারজনেই রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে ম্যানেজাররা। নাকে রুমাল ঠেসে তাঁরা ধুঁকছিলেন।

অশোক বলল, 'আর আপনাদের কষ্ট দেব না। চলুন এখান থেকে বেরুনো যাক।'

নরকযন্ত্রণা থেকে যেন মুক্তি পেলেন ম্যানেজাররা। মুখ চুপসে গিয়েছিল, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিছুটা এনার্জি যেন তাঁদের ভেতর ফিরে এল।

সবাই বাইরের রাস্তায় চলে এসেছিল।

জুট মিলের ম্যানেজার নবগোপাল ঘোষাল বারকয়েক খাবি খেয়ে বুক ভরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে বলল, 'ও, ইট'স হেল—'

অশোক বলল, 'এই হেল-এই আমাদের কয়েক হাজার এমপ্লয়ি থাকে?'

নবগোপাল তো বটেই অন্য দুই ম্যানেজারের মুখ থেকে একটি আওয়াজও বেরুল না। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে সবাই হাঁটতে লাগল।

'জেনিথ স্টিল'-এর কম্পাউন্ডে কার পার্কিং এরিয়ায় অশোকের লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে আছে। রাহেজাকে সঙ্গে করে সোজা সেখানে চলে এল সে।

তিন ম্যানেজার হাতজোড় করে পেছন পেছন যেতে যেতে একটানা বলে যাচ্ছে—

'স্যর, এখানে সেই কখন এসেছেন। এক মিনিটের জন্যেও বসেননি।'

'অনেক হাঁটাহাঁটি গেছে।'

'একটু বসে বিশ্রাম করে নিন স্যর।'

'এভাবে চলে গেলে নিজেদের খুব অপরাধী মনে হবে।'

'কিছুই করতে পারলাম না—'

অশোক বলল, 'আজ সময় হবে না। পরে যদি ফের আসা হয়, তখন যত পারেন আপ্যায়ন করবেন।'

শোফার লিমুজিনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। শশব্যস্তে গাড়ির দরজা খুলে দিল। অশোক উঠতে যাবে, হঠাৎ খানিকটা দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় তারাপদকে দেখতে পেল। লোকটা যে তাদের পেছন পেছন এসেছে আগে খেয়াল করেনি সে।

কী একটু ভাবল অশোক, তারপর রাহেজাদের দাঁড়াতে বলে তারাপদর কাছে চলে এল, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে আমাকে কিছু বলতে চান।'

তারাপদ হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞা বড়সায়েব। আমাদের কোয়ার্টার যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন ম্যানেজারবাবুরা আপনার সঙ্গে ছিলেন। তাই আর কিছু বলতে ভরসা পাইনি। এনারা লোক ভালো না। একটুন ইদিক-উদিক হলে লেবারদের ঝামেলায় ফেলে দ্যান।'

অশোক বলল, 'ওঁরা তো এখন নেই। যা বলার বলে ফেলুন—'

'বড়সায়েব, নিজের চক্ষে সব দেখে এসেচেন। আমরা যাতে একটুন ভালোভাবে থাকতে পারি, তাড়াতাড়ি তার যদিন একটা ব্যবোস্তা হয়—'

'আমি বোধহয় বলেছি চেষ্টা করব। কিন্তু—'

তারাপদ কোনও প্রশ্ন করল না। দু'চোখে বিপুল আশা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

অশোক বলল, 'আমি তো এই সেদিন আপনাদের হাউসে এসেছি। নিজেদের এই চরম খারাপ অবস্থার কথা হাউসের কর্তাদের আগে জানাননি কেন? বলেননি কেন, আমাদের মানুষের মতো বাঁচার বন্দোবস্ত করে দিন?'

মুখটা করুণ হয়ে গেল তারাপদর, 'আমরা চার-পাঁচবার হেড আপিসের সামনে ধন্না দিয়েচি, বড়কত্তাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েচি, পাহারাদাররা লাঠি চালিয়ে আমাদের ভাগিয়ে দিয়েচে। বড়সায়েব আপনার অনেক দয়া; তাই সেদিন আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন; আমাদের কী হাল নিজের চক্ষে দেখতে এসেছেন। আপনার সঙ্গে—'

তাকে থামিয়ে দিল অশোক, 'আমার কথা থাক। আপনাদের তো এতগুলো ইউনিয়ন আছে। এত কষ্ট আর অসুবিধার মধ্যে যে দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন তারা কেউ কোম্পানির কর্তাদের

জানায়নি?'

'শুনেচি জানিয়েচে, কিন্তু কিছু কাজ হয়নি। বড়সায়েব, এখন আপনার দয়া—'

'বলেছি তো চেষ্টা করব। দেখা যাক, কতটা কী করা যায়। এবার চলি।'

অশোক আর দাঁড়াল না; কার পার্কিং এরিয়ায় চলে এল। তারপর রাজেশকে নিয়ে তার লিমুজিনে উঠে পড়ল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

॥ সাত ॥

সকালের দিকে অশোকরা যখন বজবজে আসে রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা ছিল। অল্প কিছু গাড়ি, লোকজনও বেশ কম।

এখন ভরদুপুর। রাস্তার দৃশ্যটা পাল্টে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাইভেট কার, ট্রাক আর বাস কলকাতার দিক থেকে সাঁ সাঁ করে বজবজের দিকে চলেছে। উল্টোদিক থেকেও একই দৃশ্য। নানা টাইপের যানবাহন অশোকদের লিমুজিনের পাশ দিয়ে কলকাতার দিকে দারুণ স্পিড তুলে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে এখন প্রচুর মানুষ। রীতিমতো ভিড়ই বলা যায়। স্বাধীনতার পর থেকেই এই এলাকার ট্রাফিক অনেক বেড়ে গেছে।

গাড়ির জানলার বাইরে অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে ছিল অশোক। বারবার তার চোখের সামনে ব্যারাক টাইপের সেই বাড়িগুলোর ছবি ফুটে উঠছে। সে নিজেও একজন ব্লাম-ডোয়েলার। স্বাধীনতার পর টালিগঞ্জের বস্তিতে অনেক বছর কাটিয়েছে। কিন্তু ওই ব্যারাক বাড়িগুলোর তুলনায় মাঙ্গিরাম লাখোটিয়ার বস্তিবাড়িটাকে স্বর্গই বলা যায়। তাদের নানা ফ্যাক্টরির লেবারাররা কীভাবে যে ওখানে মাথা গুঁজে পড়ে আছে বছরের পর বছর। ভাবা যায় না কী জঘন্য, কুৎসিত, দুর্বিষহ জীবনযাপন!

কী ভেবে জানলার বাইরে থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে রাজেশের দিকে তাকাল অশোক। বলল, 'আপনি বলেছেন আমাদের হাউস এখানকার জুট মিল, 'জেনিথ স্টিল' আর 'ইন্ডিয়া কেমিকেল'— এই ফ্যাক্টরি তিনটে স্বাধীনতার পর ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল—'

রাজেশ আস্তে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ স্যর—'

'এই কারখানাগুলো ইংরেজরা কোন ইয়ারে বসিয়েছিল, আপনি কি জানেন?'

'এগজাক্ট ইয়ারটা বলতে পারব না। আমি তো মাত্র দশ-বারো বছর হল এই হাউসে এসেছি। তবে শুনেছি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির গোড়ার দিকে, মোস্ট প্রবেবলি লাস্ট সেঞ্চুরির শেষের দিকে বা এই সেঞ্চুরির শুরুতে ওগুলো বসানো হয়েছিল।'

'দ্যাট মিনস ওগুলোর বয়স অ্যাবাউট সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি সিক্স—'

'ওই রকমই হবে।'

'ফ্যাক্টরিগুলো বসানোর সময় খুব সম্ভব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা লেবারারদের থাকার জন্যে ওই ব্যারাকগুলো তৈরি করিয়ে দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ স্যর—'

'বাহান্ন-তিপ্পান্ন বছর মানে মোর দ্যান ফাইভ ডিকেডস। সময়টা খুব কম নয়। যে লেবারাররা একেবারে শুরুর সময় কাজে লেগেছিল স্বাভাবিক কারণেই তারা এখন আর নেই। তারপর মনে হয় পুরনো জেনারেশনের লেবারাদের জায়গায় নতুন জেনারেশনের লেবাররারা এসেছে। এখন মনে হয় থার্ড কি ফোর্থ জেনারেশন চলছে।'

'হ্যাঁ স্যর, সেই রকমই হবে।'

অশোক বলল, 'এই পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছরে লেবারারদের ওই ব্যারাকগুলো একবারও কি সারানো হয়েছে? কোনও মানুষের পক্ষে ওখানে বাস করা সম্ভব?'

রাজেশ চুপ করে রইলেন।

অশোক থামেনি, 'হাউসের বড়কর্তাদের বাদ দিলাম। ম্যানেজার তিনজনের কেউ ওখানে কখনও উঁকি মারতে যায়নি। ইন হিউম্যান মিস্টার রাজেশ। ইন-হিউম্যান।'

অনেকক্ষণ নীরবতা।

তারপর অশোকই বেশ শুরু করল, 'নানা জায়গায় আমাদের হাউসের আরও অনেক কারখানা রয়েছে। সেই সব কারখানার ওয়ার্কারদের থাকার জন্যে বজবজের মতো কোয়ার্টার আছে?'

রাজেশ বললেন, 'ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছ থেকে যেসব ফ্যাক্টরি কেনা হয়েছিল শুধু সেগুলোতেই লেবারারদের থাকার ব্যবস্থা আছে। কারণ ইংরেজ মালিকরা সেগুলো করে দিয়েছিল।'

'বজবজ ছাড়া আর কোথায় কোথায় ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো থেকে লেবারারদের কোয়ার্টার সুদ্ধ ফ্যাক্টরি কেনা হয়েছে?'

'নৈহাটির কাছে শ্যামপুরে আরও দুটো জুট মিল, হাওড়ায় একটা টেক্সটাইল মিল আর একটা রোড রোলার তৈরির কারখানা কিনেছিল আমাদের হাউস।'

'মিস্টার রাজেশ, আমি ওইসব ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের থাকার জায়গাগুলো দেখতে চাই। আজ বজবজে গেলাম। কাল সকালে আপনি আমাকে শ্যামপুরে, পরশু হাওড়ায় নিয়ে যাবেন।'

একটু ভয়ে ভয়ে রাজেশ বললেন, 'স্যর, একটা কথা বলব?'

তাঁর মুখের দিকে তাকাল অশোক, 'অত হেজিটেশন করছেন কেন? বলুন—'

'আপনি এই হাউসে আসার আগে আমি অন্য একটা ডিপার্টমেন্টে সাত-আট বছর ছিলাম। তখন বেশ কয়েকবার আমাকে শ্যামপুর আর হাওড়ার কারখানাগুলোতে যেতে হয়েছিল। বজবজে যেমন দেখেছেন ওই কারখানাগুলোর ওয়ার্কারদের থাকার জায়গা আর পরিবেশ একইরকম। নোংরা, জঘন্য, পলিউশনে ভর্তি।'

রাজেশের মনোভাবটা অনুমান করে একটু হাসল অশোক, 'আপনি হয়তো চান না, আমি শ্যামপুরে আর হাওড়ায় যাই। ঠিক

আছে আপাতত যাব না। বুঝতে পারছি, বজবজে যা দেখে এলাম, ওই দুটো জায়গায় গেলে সেই একই এনভায়রনমেন্টে একই দৃশ্য দেখতে হবে। আপনার ইচ্ছে নয় ওইরকম দমবন্ধ করা পরিবেশে আবার গিয়ে আমি কষ্ট পাই—তাই না?

রাহেজার চোখে-মুখে অস্বস্তি ফুটে ওঠে। তিনি চুপ করে থাকেন।

অশোক বলল, 'ওই সব ফ্যাক্টরি আর সেগুলোর ওয়ার্কারদের সম্বন্ধে আমার অলমোস্ট কোনও ধারণাই নেই। এদের ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশন চাই—'

রাহেজা বললেন, 'কী ইনফরমেশন বলুন। আমার জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।'

'ওই কারখানাগুলোতে কত লেবাররা কাজ করে?'

কিছুক্ষণ স্মৃতি হাতড়ে, থেমে থেমে রাহেজা বললেন, 'আমাদের দুটো চটকল হল ভেনাস জুট মিল আর জুপিটার জুট মিল। এই দুটোতে সব মিলিয়ে ন'হাজারের মতো লেবাররা। হাওড়ার টেক্সটাইল মিলে দেড় হাজার আর রোড রোলার ফ্যাক্টরিতে হাজারখানেক। অনেকদিন আগে ওই ফ্যাক্টরিগুলোতে গেছি তো। লেবারের সংখ্যাটা যা বললাম, এগজাক্ট তা নাও হতে পারে। দু'পাঁচশো এদিক-ওদিক হয়াতে হবে। তার বেশি নয়।'

'ঠিক আছে, এতেই হবে। দুটো জুট মিলে ন'হাজার, টেক্সটাইল মিলে দেড় হাজার আর রোড রোলার মিলে এক হাজার। তা হলে টোটাল মোর অর এলস সাড়ে এগারো হাজার ওয়ার্কার। এদের সবাই নিশ্চয়ই কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকে না।'

'না স্যর, দু'আড়াই হাজারের মতো ওয়ার্কার তাদের বাড়ি বা ভাড়াবাড়ি থেকেই ডিউটি দিতে আসে। ওই বজবজের মতোই।'

একটু ভেবে অশোক বলল, 'একটা ব্যাপার আমার খেয়াল ছিল না। ক্যামেরা নিয়ে বজবজে যাওয়া উচিত ছিল।'

'ক্যামেরা!' রাহেজা বেশ অবাকই হলেন, 'ক্যামেরা কী জন্যে স্যর?'

'লেবাররারা যে নরককুণ্ডে থাকে বা থাকতে বাধ্য হয়, সেই নরককুণ্ডের ছবি তুলে নিয়ে আসা যেত।'

রাহেজা বেশ অবাকই হলেন। তবে কিছু বললেন না।

অশোক জিগ্যেস করল, 'আপনার চেনা কোনও স্টিল ফোটোগ্রাফার আছে?'

'আছে স্যর—'

'অফিসে ফিরে আজই তার সঙ্গে কনট্যাক্ট করুন। বজবজ, শ্যামপুর, হাওড়া—যেখানে যেখানে আমাদের লেবাররদের জন্যে কোয়ার্টার আছে সেগুলোর তো বটেই, কোয়ার্টারগুলোর বাসিন্দাদের যতগুলো সম্ভব ছবি তুলে ডেভলাপ করে দু'দিনের ভেতর আমাকে দিতে হবে। প্রত্যেকটা ছবির পাঁচটা করে কপি চাই। যে রেমুনেশন তারা চায়, তাই দেওয়া হবে।'

রাহেজা বললেন, 'কিন্তু স্যার, মাত্র দু'দিনে এতগুলো জায়গায় যাওয়া, ছবি তোলা, সেই ছবি ডেভলাপ করা—এত সব কি সম্ভব?'

অশোক আস্তে মাথা নাড়ে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, সম্ভব নয়। ফোটোগ্রাফারকে এই দু'দিনের জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করতে বলুন। একজন ড্রাইভারও যেন নেয়। সারাক্ষণ ড্রাইভারসুদ্ধ গাড়িটা ওর কাছেই থাকবে। ড্রাইভারের মজুরিও আমরা মিটিয়ে দেব।'

কোন গহন গোপন উদ্দেশ্যে হাউসের সর্বেসর্বা ব্যক্তিটি কতকগুলো কদর্য বস্তি টাইপের বাড়ি আর সেগুলোর বাসিন্দাদের ছবির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বোঝা যাচ্ছে না। এ নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করাও ঠিক নয়। রাহেজা বললেন, 'আপনি যা বলেছেন তাই হবে স্যর—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অশোক বলল, 'এবার অন্য একটা টপিকে যেতে চাই।'

রাহেজা উৎসুক চোখে তাকালেন, 'কী টপিক স্যর?'

'সেটা পরে জানাচ্ছি। তার আগে অন্য কিছু বলে নিই। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসে আপনিই একমাত্র আমাকে ভেরি সিনসিয়ারলি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। অ্যাসিওর করেছিলেন প্রয়োজন হলে আরও হেল্প করবেন। এখন টপিকটা শুনুন।'

কোনও প্রশ্ন না করে রাহেজা উদগ্রীব হয়ে রইলেন।

অশোক বলল, 'আপনি তো-রো-চোদ্দো বছর এই হাউসে আছেন। এখানকার সবকিছুই জানেন।'

'সব ঠিক জানি না। তবে অনেকটাই জানি। আপনি কোন টপিকের কথা বলছেন?'

'আমাদের হাউসে মিস্টার বিলিমোরিয়া, মিস্টার সান্ধু, মিস্টার আগরওয়াল আর মিস্টার ভট্টাচারিয়াকে নিয়ে যে হাই-পাওয়ার কমিটি, তার কাজটা কী আর ক্ষমতাই বা কতটা?'

'সে কী! আপনি তো কমিটির চেয়ারম্যান। সবই জানেন।'

'আমি নতুন এখানে এসেছি। নামেই চেয়ারম্যান। যে চারজন মেম্বার আছেন, দে আর ভেরি ভেরি পাওয়ারফুল। বিলিমোরিয়ারা জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাটিক পদ্ধতিতে কমিটির কাজ চলে। বেশিরভাগ মেম্বার কোনও ব্যাপারে একমত হলে সেটাই করা হয়। আমার যদি আপত্তি থাকে তা নাকচ হয়ে যাবে। আমার ধারণা ওঁরা সব ব্যাপারেই এককাট্টা। শুনেছি হাউসের সব পলিশি ঠিক করে ওই কমিটি।'

'না স্যর, সব নয়, অনেকটা। কোথায় কোথায় নতুন ফ্যাক্টরি করা হবে, কত লোককে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হবে, ইনভেস্টমেন্টের জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে কত লোন নেওয়া হবে, যে কারখানা লস-এ চলছে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে কি হবে না, কোনও নতুন প্রোডাক্ট তৈরি হবে তার মার্কেটিং আর প্রচারের বন্দোবস্ত করা—মেনলি এসব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয় হাই-পাওয়ার কমিটি।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'চেয়ারম্যানের কোনও স্পেশাল পাওয়ার আছে কি?'

রাহেজা জোর দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে স্যর, বছরে তিনি নিজের পছন্দমতো পঞ্চাশ জনকে এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারেন। তা ছাড়া হাই-পাওয়ার কমিটি যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তার বাইরে হাউসের অন্য সব ব্যাপারে প্রয়োজন হলে পাঁচ থেকে সাত কোটি টাকা অ্যালট করতে পারেন। এই রকম আরও কিছু কিছু ক্ষমতা আছে চেয়ারম্যানের। সেগুলো এখন ঠিক মনে পড়ছে না। কাগজপত্র দেখে আপনাকে বলে দেব।'

রাহেজার একটা হাত ধরে আন্তরিকভাবে অশোক বলল, 'মেনি মেনি থ্যাংকস—'

॥ আট ॥

হেড অফিসে অশোককা যখন পৌঁছল তিনটে বেজে দশ। সূর্যটা পশ্চিমদিকের উঁচু উঁচু অফিস বিল্ডিংগুলোর ওধারে অনেকটাই নেমে গেছে।

এই হাউসে দুপুর একটা থেকে দুটো পর্যন্ত লাঞ্চ ব্রেক। সেই সময়টা পেরিয়ে গেছে।

অফিসে এসেই রাহেজা তাঁর কামরায় চলে গেছেন। অশোক এসেছে তার বিশাল চেম্বারে।

একটা বেয়ারা এসে সেলাম করে বলল, 'বড়ে সাহেব, লাঞ্চ রেডি হ্যায়—'

এই হাউসের সব এমপ্লয়িদের জন্য একটা মস্ত ক্যান্টিন রয়েছে। কিন্তু চেয়ারম্যান আর ডাইরেক্টরদের জন্য খাবার আসে একটা পাঁচ-তারা হোটেল থেকে।

অশোকের চেম্বারের ডানপাশে একটা অ্যান্টি-চেম্বার আছে। সেখানে বসে লাঞ্চটা সারে সে। কিন্তু এই অবেলায় আর খেতে ইচ্ছা করছে না। এখন খেলে গা ঢিস ঢিস করবে।

অশোক বলল, 'আজ আর লাঞ্চ করব না। তুমি আমার জন্যে দুটো চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি এখানে নিয়ে এসো।'

রীতিমতো অবাকই হল বেয়ারা, 'ম্রিফ দো স্যান্ডউইচ আউর কফি!'

'হ্যাঁ—'

'জি বড়ে সাহেব—' আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস হল না বেয়ারার। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে স্যান্ডউইচ আর কফি এসে গেল।

চেম্বারেই একপাশে পি.এ পার্লর শেঠনা তার টেবিলে বসে একদৃষ্টে অশোককে লক্ষ করছিল। খেতে খেতে অশোক তার দিকে তাকাল। পার্ল এমনিতে শান্ত, একটু গম্ভীর, অপ্রয়োজনীয় একটি শব্দও তার মুখ থেকে বেরয় না, চুপচাপ নিপুণভাবে নিজের কাজটি করে যায়। সেই পার্লকে আজ একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। তাঁর চোখেমুখে চাপা একটা চাঞ্চল্য নেমে রয়েছে। নাকি উদ্বেগ? যা-ই হোক, সেটা ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। পার্ল একরকম জোর করেই তা ঠেকিয়ে রেখেছে। রাহেজাকে বাদ দিলে এই হাউসে এই অবাঙালি তরুণীটি তাকে পছন্দ করে, শ্রদ্ধাও করে যথেষ্ট। আর তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হয় কীসের যেন সংকেত রয়েছে। হয়তো এমন কিছু ঘটেছে যা তার পক্ষে ভালো নয়।

অশোক বলল, 'আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন মিস শেঠনা?'

পার্ল বলল, 'আপনি আগে খেয়ে নিন। তারপর বলছি।'

খাওয়ার যেটুকু ইচ্ছাও বা অবশিষ্ট ছিল, তাও আর রইল না। হাতের স্যান্ডউইচটা নামিয়ে রেখে প্লেটটা একধারে ঠেলে দিয়ে রুমালে হাত মুছে অশোক বলল, 'এবার বলুন।'

ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ে পার্ল, 'আপনার খাওয়াটা নষ্ট করে দিলাম স্যর। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। সরি, সরি—'

'ইট্স অলরাইট। একবেলা না খেলে মানুষ মরে যায় না। আমিও মরছি না, কোনওরকম কষ্টও হবে না।' অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পার্লকে শান্ত করল অশোক, 'শুরু করুন—'

পার্ল বলল, 'স্যর, প্রিন্ট মিডিয়ার লোকেরা, আই মিন সব মেজর নিউজপেপারের জার্নালিস্টরা আপনি অফিসে আসার কিছুক্ষণ আগে এসে প্রেস কনফার্স আপনার জন্যে ওয়েট করছেন। আমাদের রিসেপশন আর পি.আর ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের বলা হয়েছিল আপনি অফিসে নেই, আপয়েন্টমেন্ট নিয়ে পরে আসবেন। কিন্তু ওঁরা কোনও কথাই শোনেননি। একরকম জোর করেই ভেতরে ঢুকে ওঁরা ওয়েট করছেন। আপনার সঙ্গে দেখা না করে এখান থেকে নড়বেন না।'

অশোক বলল, 'হঠাৎ আমাকে দর্শনের জন্যে প্রেসের এত উৎসাহ কেন?'

'স্যর, আমি ঠিক সবটা জানি না। অল্প অল্প যা শুনেছি তা হল আপনি নাকি আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে জার্নালিস্টরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চায়।'

অশোক চমকে উঠল। সে যে আজ বজবজে যাবে একমাত্র রাহেজা ছাড়া আর কেউ জানত না। বাইরের কোনও কাক-পক্ষীও টের পায়নি। কিন্তু সাংবাদিকদের নাক-কান গোয়েন্দাদের মতোই সজাগ। তারা কীভাবে যেন গন্ধ পেয়ে গেছে। সে যদি অন্য কোনও গ্রহেও যায়, এরা হয়তো তাকে ধাওয়া করে সেখানে হাজির হবে। সেনসেশনাল কোনও খবরের জন্য সরাক্ষণ এরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তেমন কিছু পেলে টপ করে তুলে নিয়ে দারুণ স্টোরি বানিয়ে ফেলবে। পরের দিনের মর্নিং এডিশনের কাগজগুলোতে দিনের প্রথম চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে সেই স্টোরি পড়তে পড়তে পাঠকের শিরদাঁড়ায় হালকা শিহরণ খেলে যায়। সেনসেশন, শুধুই সেনসেশন।

অশোক বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। তার স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো ফের স্বাভাবিক হয়ে এল। চেয়ারের পেছন দিকে পিঠটা হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে টেনশনে আছেন। নো চিন্তা, নো টেনশন। প্রেসমিট তো আমরা এভরি উইকে না হলেও এভরি ফোর্ট নাইটে একবার তো করেই থাকি।'

পার্ল বলল, 'স্যর, আমি শুধু প্রেস মিটের কথা বলছি না।'

'তা হলে?'

'বিলিমোরিয়া সাহেব চার-পাঁচ বার ফোন করে জানতে চেয়েছেন আপনি অফিসে এসেছেন কি না। এলেই যেন ওঁকে জানানো হয়।'

বিলিমোরিয়া হাই-পাওয়ার কমিটির কনভেনার। এই হাউসে যেসব বিরাট মাপের শিল্পপতিরা রয়েছেন, তিনি তাঁদের একজন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এমন ভালোমানুষ বিশ্বরঞ্জনাকে খুব কমই আছে। সব সময় মুখে ডিভাইন হাসিটি লেগেই আছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ ধুরন্ধর। হাইপাওয়ার কমিটির অন্য মেম্বারদের মতোই চতুর।

অশোকের পিঠ সোজা হয়ে গেল। স্নায়ুগুলো ফের টান টান।

পার্ল বলল, 'আপনি সবে খেতে শুরু করেছিলেন। তাই বিলিমোরিয়া সাহেবকে ফোনটা করিনি। এখন কী করব?'

অশোক হাত তুলল, 'ফোনটা আমিই করব। তার আগে বলুন তো, মিস্টার বিলিমোরিয়া কেন বার বার আমার খোঁজ করছিলেন।'

'তা আমাকে জানাননি। তবে যেভাবে বলছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল সিরিয়াস কিছু একটা ঘটেছে।'

কী ধরনের সিরিয়াস? অশোক ভাবতে চেষ্টা করল। ব্যাপারটা কি তাকে নিয়েই? নিশ্চয়ই তাই। নইলে বিলিমোরিয়া বার বার কেন তাঁর খোঁজ করবেন। পার্লের টেনশনের কারণটা এবার বোঝা যাচ্ছে। এই হাউসে আসার পর থেকেই অশোকের মনে হয়েছে, পার্ল তার শুভাকাঙ্ক্ষী। সে কোনও সমস্যায় পড়ুক বা তার কোনও ক্ষতি হোক, এই শান্ত, চুপচাপ, অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট তরুণীটি তা চায় না।

অশোক পার্লের দিকে তাকাল, 'ডোন্ট ওয়ারি মিস শেঠনা।' পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের টেনশনটা কমিয়ে দিল ঠিকই কিন্তু দুশ্চিন্তাটা তার মাথায় ঢুকে গেল। বিলিমোরিয়া তাকে কী বলতে পারেন? খুব সম্ভব তাঁর কাছ থেকে কোনও সুখবর পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুঃসংবাদটা কী হতে পারে? আন্দাজ করতে চেষ্টা করল অশোক। কিন্তু না, তলকুল কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। একসময় নয় বলে বিলিমোরিয়াকে নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ে নিজেকে হয়রান করার মানে হয় না। আগে তো বিলিমোরিয়ার সঙ্গে কথা হোক, তারপর দেখা যাবে। চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল অশোক।

পার্ল জিগ্যেস করল, 'স্যর, প্রেস কর্নারে রিপোর্টাররা বসে আছেন। আপনি নীচে গিয়ে কি তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন?'

অশোক বলল, 'আজ প্রেসমিটটা সম্ভব নয়। আমি অ-ফুলি টায়ার্ড। প্রেস কর্নারে আমাদের যে অফিসার আছেন তাঁকে বলে দিন আজ আমি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না। তিনি যেন দু'দিন বাদে ঠিক দুটোয় ওঁদের আসতে বলেন। এটাও যেন বলেন আমি ভীষণ ক্লান্ত। দু'দিন পর যখন প্রেসমিট হবে, ওঁদের অনেকটা সময় দেব। আমার হয়ে অফিসার যেন ওঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।'

'আচ্ছা স্যর—' পার্ল ফোন তুলে নিল।

অশোকও দেরি করল না। এই ফ্লোরটার ঠিক নীচের ফ্লোরেই ডাইরেক্টরদের চেম্বার। টেলিফোন তুলে নাম্বার দেখে দেখে আঙুল দিয়ে ঘোরাতে লাগল।

একটু পরেই বিলিমোরিয়ার শান্ত, ধীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যালো—'

'গুড আফটার নুন মিস্টার বিলিমোরিয়া। অশোক ব্যানার্জি বলছি। আমার পি.এ বলেছেন আপনি বেশ কয়েকবার আমার খোঁজ নিয়েছেন।'

'শুভ অপরাহ্ণ' জানিয়ে বিলিমোরিয়া বললেন, 'ঠিক খবরই

পেয়েছেন ব্যানার্জি সাহেব—'

'এনিথিং আর্জেন্ট?'

'ভেরি আর্জেন্ট।'

অশোক অপেক্ষা করতে লাগল। সামান্য পরে বিলিমোরিয়া বললেন, 'আমরা হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা আজই একটা মিটিংয়ে বসব। আপনি হাউসে না থাকায় সেটা করা সম্ভব হচ্ছিল না। আপনাকে যখন পাওয়া গেছে, আধঘণ্টা পর আমরা কনফারেন্স রুমে একসঙ্গে বসতে চাই। এখন তিনটে বেজে চল্লিশ। চারটে শ্রে কাইন্ডলি যদি আমাদের কনফারেন্স হল-এ চলে আসেন—'

অশোক বলল, 'আই অ্যাম রিয়ালি সরি মিস্টার বিলিমোরিয়া, আজ আমার পক্ষে মিটিং অ্যাটেন্ড করা সম্ভব নয়।'

'আপনি এই হাউসেরই শুধু নয়, হাই-পাওয়ার কমিটিরও চেয়ারম্যান। আপনাকে ছাড়া কোনও মিটিং বা কনফারেন্স অসম্ভব।'

খিদেটা মরে গিয়েছিল। হঠাৎ সেটা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পেটের ভেতর আগুন যেন গনগন করছে। কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। পাকস্থলী এতক্ষণ ফাঁকা থাকায় মাথাটা খুব ঘুরছে। কপালের দু'পাশের রগগুলো দপ দপ করছে। অশোক বলল, 'আমার শরীর ভীষণ খারাপ। বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। এখনই আমি বাড়ি ফিরে যাব।'

'সে কী! আপনি যে অসুস্থ এই খবরটা তো পাইনি। আমরা এখনই আসছি—' বিলিমোরিয়ার কথা শুনে মনে হল তিনি খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন।

অশোক বলল, 'আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। বাড়ি—' তার কথা শেষ হতে না-হতেই খুট করে একটা আওয়াজ হল। বিলিমোরিয়া ফোন নামিয়ে রেখেছেন।

সামান্য পরেই শুধু বিলিমোরিয়া নন, মিস্টার সান্ধু, মিস্টার আগরওয়াল এবং মিস্টার ভট্টাচারিয়া হুড়মুড় করে অশোকের চেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

অশোক উঠে দাঁড়াল, 'আসুন আসুন—বসুন—' সে লক্ষ করেছে হাই-পাওয়ার কমিটির এই মেম্বারদের চোখে-মুখে প্রবল উদ্বেগ। কিন্তু সেটা কতটা আসল কতটা মেকি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সবাই বসে পড়লে অশোক বিব্রতভাবে বলল, 'আপনারা এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছেন, আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।'

আগরওয়াল বললেন, 'এ কী বলছেন ব্যানার্জি সাহেব, আপনি আমাদের হাউসের চেয়ারম্যান অ্যান্ড এমডি, আপনার তবিয়ত আচানক খারাপ হয়ে পড়েছে, আমাদের চিন্তা হোবে না? আলবত হোবে।'

সান্ধু জিগ্যেস করলেন, 'কী অসুবিধে হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেব। শিরে চক্কর, ব্লাড প্রেশারের প্রবলেম, ব্লাড সুগারের ঝামেলা—কী মনে হোচ্ছে?'

অশোক বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি বাড়ি চলে যাই, রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া মিস্টার সোমদেব চ্যাটার্জি আমার জন্যে খুব নামকরা একজন ডক্টর ঠিক করে দিয়েছেন। ডক্টর প্রণবেশ সান্যাল। ওল্ড বালিগঞ্জে আমি যেখানে থাকি তার কাছাকাছি বালিগঞ্জ ফাঁড়ির গায়ে তাঁর চেম্বার। বাড়ি গিয়ে তাঁকে 'কল' দেব। দু'দিনেই উনি আমাকে ফিট করে দেবেন। প্লিজ এত টেনশন করবেন না।'

বিলিমোরিয়ারা সবাই একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'না না, আপনার শরীরের হাল ভালো নয়, এই অবস্থায় ইন্ডিয়ার একজন টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, এই হাউসের লিডিং পার্সনকে ছেড়ে দিতে পারি না। এই ম্যাডন স্ট্রিটে ডক্টর দত্তগুপ্ত'র চেম্বার। তাঁকে এখন পাওয়া যাবে। এক্ষুনি 'কল' দিচ্ছি।'

মিস্টার সান্ধু অশোকের পারমিশন নিয়ে তারই একটা ফোন তুলে ডক্টর দত্তগুপ্তকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসতে বললেন।

অশোক তাকিয়ে আছে। চারটি উদ্বিগ্ন মুখের আড়ালে চারটি অদৃশ্য চতুর মুখ যেন সে দেখতে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে এদের অভিসন্ধিটা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। নানা কৌশলে তাকে আটকে রেখে আর্জেন্ট মিটিংয়ে টেনে নিয়ে যাওয়াই বিলিমোরিয়াদের উদ্দেশ্য।

ডক্টর দত্তগুপ্ত চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে অশোকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে মিস্টার সান্ধু বললেন, 'ইনি, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা ভীষণ অ্যাংশাস। কী সমস্যা হয়েছে কাইন্ডলি দেখুন—'

ডক্টর দত্তগুপ্ত স্টেথো দিয়ে অশোকের বুক, পিঠ পরীক্ষা করলেন। হার্টবিট আর হাতের পাল্‌স দেখলেন। তারপর ব্লাডপ্রেশার মাপলেন।

পরীক্ষা শেষ হলে চার উৎকণ্ঠিত ডিরেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'কী মনে হল ডক্টর?'

ডক্টর দত্তগুপ্ত বললেন, 'পাল্‌স বিট ইররেগুলার, ব্লাড প্রেশার ফল করেছে। আমার ধারণা ব্লাড সুগারেরও গোলমাল আছে। সেটা ইমিডিয়েটলি টেস্ট করা দরকার। অন্তত দু'দিন রেস্ট নেওয়া প্রয়োজন।' প্রেসক্রিপশন লিখে ফিস নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অশোক সামান্য হাসল, 'কী ভেবেছিলেন মিস্টার বিলিমোরিয়া, মিস্টার সান্ধু, মিস্টার আগরওয়াল আর মিস্টার ভট্টাচারিয়া, কী ভেবেছিলেন আপনারা, আমার শরীর খারাপ হয়নি? আশা করি ডক্টর দত্তগুপ্ত যা বলে গেলেন তারপর আপনাদের সন্দেহটা আর নেই।'

হাই-পাওয়ার কমিটির চারজন ঘাগি মেম্বার ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েন, 'এ কী বলছেন ব্যানার্জি সাহেব, আপনার শরীরের কন্ডিশনের কথা ভেবেই তো ডক্টর দত্তগুপ্তকে 'কল' দিয়েছিলাম। আমাদের কী টেনশন হচ্ছিল বলে বোঝাতে পারব না।'

অশোক চারজনকে ধীরে ধীরে দেখে নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, 'আর্জেন্ট মিটিংটা অ্যাভয়েড করার জন্যে আমি কিন্তু অসুস্থ হওয়ার ভান করিনি। দু'দিন অফিসে আসব না। ডক্টর দত্তগুপ্ত রেস্ট নিতে অ্যাডভাইস দিয়েছেন। এই দু'দিন বাড়িতেই থাকব।'

বিলিমোরিয়া পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো বললেন, 'রেস্টটা আপনার খুব দরকার। ডক্টর দত্তগুপ্ত যেমন যেমন বলেছেন তেমনটাই করবেন। প্রেসক্রিপশনে তিনি যে ওষুধের নাম লিখে দিয়েছেন সেগুলো কিন্তু মনে করে খাবেন। ঠিক সুস্থ হয়ে যাবেন।'

অশোকের ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই ছিল। সেটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, 'ওষুধ খেয়ে আর রেস্ট নিয়ে ততটা নয়, আপনাদের মতো আপনজনদের শুভেচ্ছায় সুস্থ হব। সে যাক, আজ টিউস ডে, দু'দিন পর ফ্রাইডে'তে আর্জেন্ট মিটিটা ডাকুন। ওইদিন বেলা দু'টো থেকে তিনটে পর্যন্ত আমার একটা প্রেসমিট আছে। তার আগে বা পরে মিটিংটা হলে আমার পক্ষে কনভেনিয়েন্ট হয়।'

'তাই হবে। ফ্রাইডে মর্নিংয়ে আপনি অফিসে আসার আগেই মিটিংয়ের টাইমটা জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে ব্যানার্জি সাহেব, আমরা এখন চলি। আপনিও বাড়ি ফিরে যান। উইশ ইউ বেস্ট অফ হেলথ অ্যান্ড স্পিরিট।'

'আপনারা যে আমার জন্যে এত ভাবেন সেজন্যে অনেক, অনেক ধন্যবাদ।'

বিলিমোরিয়ারা চলে গেলেন। অশোক পার্লের দিকে তাকাল, 'মিস শেঠনা, দু'দিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। আপনাকে যেসব অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে; সেগুলো করে রাখবেন। প্লিজ, মিস্টার রাহেজাকে আসতে বলুন।'

পার্ল বলল, 'এক্ষুনি ওঁকে কনট্যাক্ট করছি।' সে ব্যস্তভাবে ডায়াল করতে লাগল।

এই ফ্লোরেই শেষ প্রান্তে রাহেজার ছোট চেম্বার। দু'তিন মিনিটের ভেতর তিনি চলে এলেন।

অশোক চেয়ার থেকে উঠে পড়ল, 'চলুন, বাড়ি ফিরব।'

'আসুন স্যর।' অশোকো যখন চেম্বারের দরজার কাছাকাছি চলে গেছে, পার্ল উঠে দাঁড়িয়ে খুব আন্তরিক গলায় বলল, 'স্যর, খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।'

থেমে গেল অশোক। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পার্লের দিকে তাকাল। অবাঙালি তরুণীটির আশ্চর্য মায়ামাখানো মুখমণ্ডলটি তার কী ভালো যে লাগল! এই বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারে দু'জনকে তার বড় আপনজন মনে হয়। চন্দ্রকান্ত রাহেজা আর পার্ল। তেমন আবেগ-টাবেগ তার নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে বুকের ভেতর হাল্কা ঢেউয়ের মতো কী যেন খেলে গেল। গাঢ় গলায় অশোক বলল, 'মেনি মেনি থ্যাংকস মিস শেঠনা।' বলেই মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

নিজস্ব লিমুজিনে ওল্ড বালিগঞ্জ ফিরতে ফিরতে জানলার বাইরে আনমনা তাকিয়ে ছিল অশোক। এই পড়ন্ত বেলায় সোনালি মলিন সোনালি-হলুদ রোদ মহানগরের ওপর উপচে পড়েছে, রাস্তায় যানবাহনের স্রোত, যেদিকেই তাকানো যাক বিপুল জনতা। চারপাশ থেকে উঠে আসছে রকমারি আওয়াজ। মানুষের কলরোল।

কোনও কিছুই যেন সেভাবে চোখে পড়ছে না। রাস্তার দু'ধারের দৃশ্যগুলো বহুবার জলে-ধোওয়া ছবির মতো ঝাপসা ঝাপসা। শব্দগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

বারবার একটা প্রশ্ন তার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা আচমকা কেন আর্জেন্ট মিটিং ডেকে বসলেন? কী অভিসন্ধি তাঁদের? বাইরে ভালোমানুষের মুখোশ পরে সরাক্ষণ যেন নতজানু হয়ে আছেন। কিন্তু তাকে যে আদৌ পছন্দ করেন না, তা কি আর অশোক জানে না! নেহাত সোমদেব চ্যাটার্জি তাকে অদ্ভুত এক খেয়ালে এই বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাম্রাজ্যের চূড়োয় বসিয়ে একটা প্রায়-অবিশ্বাস্য এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ দিয়েছেন, তা অতীব তিক্ত বড়ি গেলার মতো বিলিমোরিয়াদের মেনে নিতে হয়েছে। অসাবধান হয়ে ভুল একটা স্টেপ ফেললেই এঁরা তাকে দূরমুশ করে ছাড়বেন। অশোক ভাবতে চেষ্টা করল, এমন কিছু কী সে করেছে, ফেলেছে ভুল দিকে এমন কোনও পদক্ষেপ যাতে এই হাউসের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে? তেমন কিছুই মনে পড়ছে না। তবে দু'দিন পর যখন সে আর্জেন্ট মিটিংয়ে যাবে, তাকে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। কিন্তু প্রস্তুতি নেবে কীভাবে। চার ধুরন্ধর শিল্পপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় গেলে কিছু অস্ত্র তো হাতে চাই।

রাহেজা ব্যাকসিটে অশোকের পাশেই বসেছিলেন। লিমুজিন ওঠার পর থেকেই তিনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন। খুব আস্তে ডাকলেন, 'স্যর—'

অন্যমনস্ক অশোক চমকে ঘাড় ফেরাল। রাহেজা বললেন, 'আপনি যদি পারমিশন দেন, একটা কথা বলব?'

'বেশ তো বলুন—'

'আপনি এত ভাবছেন কেন স্যর।'

'আমি কী ভাবছি আপনি জানেন?' একটু যেন অবাকই হল অশোক। যে চিন্তাটা তার মাথায় চেপে বসেছে রাহেজার ডাকে সেটা ঘেঁটে যাওয়ায় বিরক্তই হয়েছে।

'মনে হচ্ছে জানি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অশোক। রাহেজা বললেন, 'বিলিমোরিয়া সাহেবদের আর্জেন্ট মিটিংয়ের ব্যাপারটা তো?'

অশোকের মুখ থেকে বিরক্তি আর কাঠিন্য উধাও। নরম গলায় বলল, 'এগজাক্টলি। আমি সেটাই ভাবছিলাম। আপনি দেখছি একজন থট-রিডার। ফাইন। ওঁরা কী কারণে ওই মিটিংটা ডেকেছিলেন আর আমাকে সেটা অ্যাটেন্ড করার জন্যে কেন এত প্রেশার দিচ্ছিলেন, বলতে পারেন?'

'সবটা না হলেও অনেকটাই বলতে পারি। বাকিটাও গেস করেছি।'

শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় অশোকের। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে।

রাহেজা বলতে লাগলেন, 'আপনি যে আজ বজবজ গিয়েছিলেন সেই খবরটা বিলিমোরিয়া সাহেব, সাদ্ধু-সাহেবরা তক্ষুনি পেয়ে গেছেন। শুধু এঁরাই নন, চ্যাটার্জি সাহেবের কাছেও পৌঁছে গেছে বলেই আমার ধারণা।'

চকিতে অশোকের খেয়াল হল, সোমদেব চ্যাটার্জি মাঝে মাঝে তাকে ফোন করেন। এই হাউসে এসে তার কেমন লাগছে, যে মিশন নিয়ে সে এখানে এসেছে তার কতটা কী করা গেল, জানতে চান। এটাই তো স্বাভাবিক। কেননা তিনিই তাকে এখানে এনে সামাজিক প্যাটার্ন পাল্টে দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন। সে তাঁর লক্ষ্যের দিকে কতটা এগতে পেরেছে সে সম্বন্ধে সোমদেবের কৌতূহল থাকতেই পারে। কিন্তু সে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে কথা বলছে, এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান বলে মনে হয় না।

অশোক বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি এই হাউসে আর আসেন না। এখানকার সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। বজবজের খবরটা তাঁর কাছে যাবে কেন?'

উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন রাহেজা। বিরতভাবে বললেন, 'আমার কেন যেন মনে হল চ্যাটার্জি সাহেবকেও খবরটা দেওয়া হয়েছে। সরি স্যর, এই মনে হওয়াটা ঠিক নয়। হঠাৎ বলে ফেলেছি।'

তাদের হাউসে হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা ছাড়াও আরও অনেক শিল্পপতি আছেন। মুখ ফসকে সোমদেব চ্যাটার্জির নামটাই বা বললেন কেন চন্দ্রকান্ত রাহেজা, আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই তড়িঘড়ি ভুলটাই বা শুধরে নিলেন কেন? একটা খটকা থেকেই গেল। রাহেজা যখন প্রসঙ্গটা এড়াতেই চাইছেন, এ নিয়ে আর কিছু জানতে চাইল না অশোক। বলল, 'একটা ব্যাপার ভেবে অবাক হচ্ছি, আমরা হাউসের কারওকে কিছু না জানিয়ে বজবজে গিয়েছিলাম। এই খবরটা হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বারদের কাছে কী করে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল?'

সোমদেব চ্যাটার্জির ব্যাপারে গুঁতিয়ে গেলেও বিলিমোরিয়াদের সম্বন্ধে কোনও রকম লুকোছাপা বা ঢাকাঢাকি নেই। রাহেজা অকপটে বলে গেলেন, 'স্যর, আমাদের হেড অফিসে তো বটেই, অন্য অফিসগুলোতে আর প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে হাই-পাওয়ার কমিটির স্পাই রয়েছে। কে আসছে, কী করছে, এই স্পাইরা বিলিমোরিয়া সাহেবদের তক্ষুনি তা জানিয়ে দেয়। স্পেশালি আপনার প্রতিটি মুভমেন্টের ওপর ওঁরা নজরদারির ব্যবস্থা করেছেন।'

অশোক চমকে উঠল, 'কী বলছেন আপনি! আমি এই হাউসের চেয়ারম্যান অ্যান্ড এমডি। আমার ওপরেও স্পাই লাগানো হয়েছে! স্ট্রেঞ্জ! কারণটা কী?'

একটু ইতস্তত করে রাহেজা বললেন, 'কারণটা আমি অনুমান করতে পারি। আপনাকে বলতেও পারি। কিন্তু আমি যে বলেছি তা জানাজানি হলে—'

রাহেজার কেন ভয়, কেন এত শঙ্কা তা কি আর বুঝতে পারছে না অশোক? রাহেজা বাড়ির দিকে যেতে যেতে একের পর এক যে সব খবর দিচ্ছেন, বিলিমোরিয়াদের কানে তা গেলে তাঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

অশোক বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ জানবে না। আপনার ক্ষতি হতে পারে, এমন কিছু কি আমি করতে পারি! আপনাকে বন্ধু বলেই তো ভাবি, না কি?'

রাহেজা জানেন, টালিগঞ্জের বস্তি থেকে আসা এই যুবকটি একজন সৎ মানুষ। তার কোনও ভান নেই, যা বলে তার এতটুকু

নড়চড় হয় না। দ্বিধাটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

রাহেলা বললেন, 'স্যর, আপনি যা জানতে চাইছেন, এবার বলি। হাই-পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা তো আছেনই, এই হাউসের সঙ্গে আরও অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টও জড়িয়ে আছেন। তাঁদের একজনও আপনাকে বিশ্বাস করেন না।'

'মানে?'

'আপনি সোসাইটির যে লেভেল থেকে উঠে এসেছেন আর এঁদের লেভেলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আপনার মিশনের কথা ওঁরা জানেন। ওঁদের ভয়, এমন কিছু আপনি করতে পারেন, যাতে এই হাউসের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই আপনাকে চোখে চোখে রাখেন।'

'আই সি। এই হাউসের ক্ষতি করার কোনও পরিকল্পনাই আমার নেই। অকারণে ওঁরা ভূত দেখছেন। আমি যে জন্যে এসেছি সেটা হয়ে গেলেই টালিগঞ্জে বস্তির সেই প্যালেসে ফিরে যাব। ওঁদের এত ভয় আর টেনশন কেন?'

'স্যর, যা করতে এসেছেন তা বিলিমোরিয়া সাহেবরা কি করতে দেবেন? আই ডাউট।'

অশোক হাসল, 'দেখা যাক। মিস্টার রাহেজা দুটো দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে নানা বিষয়ে আমরা ডিসকাস করব। ও হ্যাঁ, আপনার কাছ থেকে আরও কিছু ইনফরমেশন চাই।'

রাহেজা বললেন, 'আমার জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।'

'থ্যাংক ইউ—'

লিমুজিন একসময় ওল্ড বালিগঞ্জে পৌঁছে যায়।

॥ নয় ॥

সেই সকালে স্নান করে বজবজে গিয়েছিল অশোক। বাড়ি ফিরে ঘণ্টাখানেক রেস্ট, তারপর বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার চালিয়ে তার তলায় দাঁড়াল সে। অঝোরে জল ঝরে মাথার ওপর পড়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আবদুল্লা ধারাস্নানের পর মনে হল সারাদিনের সব ক্লান্তি ধুয়ে গেছে।

শাওয়ার বন্ধ করে গা মুছে টাওয়াল জড়িয়ে বেডরুমে চলে এল অশোক। ঘরের পোশাক পরে চুল আঁচড়ে পালকের মতো হাল্কা টুপি পায়ে গলিয়ে ড্রইং রুমে এসে বসল।

খিদেটা আজ তার সঙ্গে জবর মজা করছে। বজবজে লেবারারদের কোয়ার্টারগুলো যখন ঘুরে ঘুরে দেখছে সেটা উধাও, তারপর ফেরার পথে সেটা জানান দিল। অফিসে এসে কফি আর স্যান্ডউইচ নিয়ে যখন বসেছে, প্রেস কর্নারে সাংবাদিকদের ধর্না দিয়ে পড়ে থাকা, আর্জেন্ট মিটিংয়ে বসার জন্য নানা কৌশলে হাই-পাওয়ার কমিটির তার ওপর চাপ সৃষ্টি, তখন খিদেটা আর নেই। বাড়িতে ফেরার পর শাওয়ারের ধারায় সারা শরীর বেয়ে যখন অবিরাম ভিজে চলেছে, ফের গনগনে মেজাজে সেটা ফিরে এসেছে।

এদিকে বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। এখন ভারী কিছু খেলে রাতের ডিনারটা স্কিপ করতে হবে।

শশব্যস্ত বেয়ারারা একটু দূরে হুকুম তামিল করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

টালিগঞ্জে থাকার সময় হাল্কা খাবার ছিল মুড়ি, নইলে মালতী কাকিমার হাতে গড়া আটার রুটির সঙ্গে এখো গুড় বা বেগুনভাজা। এখানে ওই ধরনের প্রোলেটারিয়ানদের খাবারের কথা কেউ ভাবতেও পারে না। সাড়ে তিন মাস এই বিল্ডিংয়ে কাটিয়ে অশোকের খাদ্যতালিকাও বদলে গেছে। হাল্কা খাবার বলতে এখন তার পছন্দ চিজ স্যান্ডউইচ, হাফ-বয়েলড ডিম, আলুভাজা, কয়েক টুকরো শসা, জেলি। তারপর এক কাপ গ্রিন-টি। একটা বেয়ারাকে দিয়ে সেসব আনিয়ে নিল সে। খেতে খেতে ঠিক করে ফেলল, আজকের বাকি সময়টা রেডিওতে হেমন্ত, সন্ধ্যা, লতা, আশা, রফি আর মুকেশদের গান শুনে, ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাবে, তারপর রাত বাড়লে ডিনার সেরে সোজা বিছানায়। অন্য কোনও ওজনদার, জটিল চিন্তা সে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে দেবে না। আজ পুরোপুরি রেস্ট।

এ বাড়ির প্রতিটি বেডরুম, ড্রইংরুম এবং ডাইনিংরুমে টেলিফোন রয়েছে। আচমকা অশোকের টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল।

অশোক টেলিফোন তুলে হ্যালো বলতেই ওধার থেকে সোমদেব চ্যাটার্জির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'শুনলাম, বজবজ থেকে অফিসে ফিরে আসার পর তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। এখন কেমন আছো?'

অশোক চমকে উঠল। চন্দ্রকান্ত রাহেজা বিকেলে ওল্ড বালিগঞ্জে ফেরার সময় সবটা খোলসা করে না বললেও আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সোমদেব চ্যাটার্জি তার গতিবিধির ওপর সবসময় নজর রাখেন। তিনি ঠিক খবরটাই দিয়েছিলেন।

সোমদেব শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো বললেন, 'ডক্টর দত্তগুপ্ত যে ওষুধ লিখে দিয়েছেন ঠিকমতো খাবে। যদি দরকার হয়, যে ডাক্তার তোমার জন্যে ঠিক করা আছে, মানে যিনি, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে তাঁর চেম্বার—মনে আছে তো?'

'আছে।'

'তাঁকে 'কল' দেবে অসুখ-টসুখ যেমনই হোক, নেগলেক্ট কোরো না—'

'না, না—'

'শুনেছি, রেস্ট নেবার জন্যে দু'দিন ছুটি নিয়েছ—'

দেখা যাচ্ছে তার প্রতিটি মুভমেন্ট, সে কী করছে না করছে, সব খবর রাখেন সোমদেব। তাঁর নজরদারির বাইরে একটা পা ফেলারও উপায় নেই। তা সোমদেবের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবাভাবি বা বাড়তি চাপ নেবার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে কথাবার্তা যা হবার সোজাসুজিই হবে। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠল অশোক। তবে সৌজন্যের সীমারেখাটা সে কখনও পেরবে না। বলল, 'আপনি ঠিকই শুনেছেন। শোনারই কথা।

১৫০তম বর্ষ উদযাপন
ভদ্রেশ্বর পৌরসভা
ভদ্রেশ্বর হুগলী

অমৃতলোক পৌরসভা ১৫০ তম বর্ষে (২০১৮-১৯) বঙ্গসংস্কৃতি প্রতিবেদন বিভিন্ন অনুষ্ঠান সুচিত্র মাধ্যমে উৎসব পালিত হবে বা আগামী ৩১ শে মার্চ ২০১৯ এ সমাপ্ত হবে।

সকলকে জানাই পৌরসভার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রণব চক্রবর্তী
পৌরপ্রধান
ভদ্রেশ্বর পৌরসভা

গ্রীষ্ম - বর্ষা - শীতে মাঠে মাঠে যাদের জীবন কাটে
আমরা আছি তাদের পাশে।
দূরভাষ : ২৪৪১-৪৩৬৬-৪৩৬৭
ই-মেল : info@benfed.org
ওয়েবসাইট : www.benfed.org
benfed
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ
(বেনফেড)
প্রধান কার্যালয় : সাউথএন্ড কনসার্ট্স,
১৪৮এ, রাজডাঙ্গা মেন রোড, কর্ম তাঁত, কলকাতা - ৭০০ ১০৭
সমবায়ী মন গড়ে তুলুন
কৃষি উপকরণ ব্যবসায় ও উপদেশের জন্যে বহু বিশেষ, শস্য সংরক্ষণ এ কারিগরি ব্যবহার প্রদান ও সমবায়ে কৃষি ও গ্রামীণ শক্তিই উন্নয়নে সর্বাধিক কৃষিজ পণ্যের ক্রয়ে সাহায্য করা।

আপনার আনেক গোপন সংবাদদাতা আছে— তাই তো?

উত্তর নেই। আনেকক্ষণ অপেক্ষা করে অশোক বলল, 'লাইনটা কি কেটে দিলেন?'

এবার সাড়া পাওয়া গেল। সোমদেব বললেন, 'না। ইউ আর অ্যান ইনটেলিজেন্ট ইয়াং ম্যান। তুমি ঠিকই গেস করেছ, তোমার অসুস্থ হওয়া আর ডক্টর দত্তগুপ্তকে ডেকে আনার খবরটাও আমার জানা।'

'হাই-পাওয়ার কমিটির আর্জেন্ট মিটিংটা যে আমার জন্যেই ক্যানসেল হয়ে গেছে সেটাও নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়।'

হাল্কা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। হাসতে হাসতেই সোমদেব বললেন, 'না, নয়। মোর অর দেস সাড়ে তিন মাস, তুমি আমাদের হাউসে এসেছ। কেন তোমার এখানে আসা, কী তোমার মিশন বা ড্রিম, বেশ ক'টা প্রেস মিটে, চেম্বার অফ কমার্সগুলোর কনফারেন্সে বা ইউনিভার্সিটির সেমিনারে পার্টিসিপেট করে চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছে। সারা দেশের হাইলি সার্কুলেটেড নিউজ পেপারগুলোর ফ্রন্টপেজে এলাবোরেটলি সেসব ছাপা হয়েছে। এক্সট্রিমলি সেনশনাল নিউজ। হোল কান্ট্রি, পার্টিকুলারলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড তোমার এক্সপেরিমেন্টের জন্যে ইগারলি ওয়েট করে আছে। কিন্তু তোমার ড্রিম বা মিশন পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। কাজটা কিন্তু শুরু হবে বা হতে পারে ওই আর্জেন্ট মিটিংটার পর।'

হকচকিয়ে গেল অশোক। 'মানে? ওই মিটিংয়ের সঙ্গে আমার মিশন বা এক্সপেরিমেন্টের কী সম্পর্ক?'

'তা এখনই বলা যাচ্ছে না।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

'এই প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়া যাবে না। এটুকু বলতে পারি, ওই মিটিংটা তোমার পক্ষে বিরাট টেস্ট। প্রিসাইজলি যুদ্ধও বলা যায়। লড়াইটা কিন্তু জেতা চাই। বেস্ট অব লাক। ছাড়ছি—'

ধীরে ধীরে হাতের ফোনটা ক্রেডলে নামিয়ে উঠে পড়ল অশোক। সোমদেব টেস্টের কথা বলেছেন, যুদ্ধের কথা বলেছেন। কী ধরনের পরীক্ষা? কী ধরনের যুদ্ধ? মাথার ভেতরটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধে নামতে শুরু করেছে। বেয়ারারা সারা বিল্ডিংয়ের প্রতিটি ঘর, হল, সিঁড়ির আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। চারপাশের বিশাল বিশাল ম্যানসনগুলোতেও অজস্র আলো। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের ভেপার ল্যাম্পগুলোও আলো বিতরণ করে চলেছে।

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে অশোক বাইরের মস্ত হলঘরে চলে এল। আর তখনই চোখে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন রাহেলা। তিনি এই বিল্ডিংয়েরই একতলায় থাকেন। ছোট্ট পরিবার। চন্দ্রকান্ত, তাঁর স্ত্রী আর পনেরো-ষোলো বছরের একটি মেয়ে। মেয়েটি প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ছে। খুবই ভদ্র, শান্ত ফ্যামিলি।

অশোক দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রাহেলা কাছাকাছি আসতে বলল, 'আপনি এসেছেন, ভালো হয়েছে। নইলে ফোন করতাম।'

কচ্চুমাচু হয়ে রাহেলা বললেন, 'স্যর, আমার আসতে বেশ দেরি হল। আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই। আই অ্যাম সরি—'

অফিসে সারাক্ষণই অশোকের কাছাকাছি থাকেন রাহেলা। সে ক্লাবে বা অন্য কোথাও গেলেও রাহেলাকে তার সঙ্গে যেতে হয়। বাড়িতে ফেরার পরও অনেকটা সময় তার কাছে কাটান। রাহেলার প্রতিটি দিনের পাক্কা ষোলোটি ঘণ্টা অশোকের জন্য বরাদ্দ। বাকি আট ঘণ্টা তাঁর নিজস্ব। পারফেক্ট ছায়াসঙ্গী।

অশোক বলল, 'এত বিব্রত হচ্ছেন কেন? মিসেসের সমস্যাটা কী?'

রাহেলা জানালেন, তাঁর স্ত্রীর অনেক দিনের পুরনো একটা রোগ আছে। কলিক পেইন। ক্রনিক ডিজিস। পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। অনেক ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। ওষুধ-টোষুধ খেয়ে বেশ কিছুদিন ভালো থাকেন। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সেটা চাড়া দিয়ে ওঠে। বছর দেড়েক বাদে আজ ফের কলিক পেইনটা শুরু হয়েছে।

অশোক হাল্কা ধমকের সুরে বলল, 'কী আশ্চর্য, ওঁকে ফেলে চলে এলেন কেন? একটা ফোন করে দিলেই তো হতো। সে যাক, ট্রিটমেন্টের কী ব্যবস্থা হয়েছে?' ডাক্তারকে 'কল' দিয়েছেন?'

রাহেলা বললেন, 'আমাদের একজন ফিজিসিয়ান আছেন। খুবই ভালো ডাক্তার। পনেরো-ষোলো বছর আমার মিসেসকে দেখছেন। তাঁকে ফোন করেছিলাম। ফোনেই ওষুধের নাম বলে দিয়েছেন। কিনে এনে ওঁকে খাওয়ানো হয়েছে। কষ্টটা অনেক কমে গেছে। ডাক্তার বলেছেন, কাল যে কোনও সময় এসে মিসেসকে দেখে যাবেন।'

'ভালোই হল, দু'দিন আমার ছুটি, অফিসে যেতে হবে না আপনাকেও। ডাক্তার যখনই আসুন, আপনি তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি মিসেসের ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে কথা বলতে পারবেন। এখন চলুন—'

প্রশস্ত হলঘরটার শেষ মাথায় লিফ্ট। অশোক তেতলায় থাকে। লিফ্টে ওপরে উঠে এল দু'জনে। প্রতিটি ফ্লোরের নকশা প্রায় একই ধাঁচের। ছ'টা করে রাজকীয় বেডরুম ছাড়া হলঘর। হলঘরটার বাইরে দক্ষিণ দিকে বিশাল ব্যালকনি। পুরো ব্যালকনিটা জুড়ে ছ'ইঞ্চি পুরু কার্পেট। মহার্ঘ সোফা, সেন্টার টেবিল, সাইড টেবিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এখান থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত শহরের এপার্মেন্ট বিস্তার চোখে পড়ে। উঁচু উঁচু বিল্ডিং, প্রচুর গাছপালা, ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁ-চকচকে রাস্তায় ট্রাম, বাস আর নানা ধরনের যানবাহনের ছোটাছুটি। আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।

দু'জনে ব্যালকনিতে এসে বসল।

রাহেলা বললেন, 'স্যর আপনার পারমিশন নিয়ে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন, বলুন—'

'আজ সেই সকাল থেকে আপনার শরীরের ওপর প্রচণ্ড স্ট্রেস চেল্লে। প্রেশার ভীষণ ফ্লাকচুয়েট করছিল, পাল্স বিট ইররেগুলার হয়ে গিয়েছিল। আপনার কিন্তু রেস্ট নেওয়া দরকার। সিরিয়াস ডিসকাসন না হয় কালই হবে।'

অশোক বলল, 'অফিসে শরীরটা বেশ খারাপ লাগছিল। বাড়ি ফিরে শাওয়ার খুলে অনেকক্ষণ স্নান করে কিছু খেয়ে নিয়েছি। এখন ফ্রেশ লাগছে। মিস্টার রাহেলা, এত বড় প্যালেসের মতো বিল্ডিংয়ে আমি একেবারে একা। কুক, বেয়ারা, অন্যসব কাজের লোক অনেক আছে। কিন্তু আপনি ছাড়া কথা বলার মতো আর কেউ নেই। বেয়ারারা কাছেই আছে। তাদের কারওকে বলুন, আমাদের কফি দিয়ে যাক।'

কফি এসে গেল। খেতে খেতে অশোক বলল, 'আপনি স্পষ্ট করে না বলে যে হিন্টটা দিয়েছিলেন তা ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট, কারেক্ট।'

রাহেলা অবাক চোখে তার দিকে তাকালেন, 'কীসের হিন্ট স্যর!'

'আমার বজবজ যাওয়ার ব্যাপারটা। স্নান সেরে ডাইনিং রুমে বসে খাচ্ছি, সোমদেব চ্যাটার্জির ফোন এল। উনি কী বললেন, জানেন?'

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন রাহেলা।

কফি-মগে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে অশোক বলল, 'আমার বজবজে যাওয়ার খবরটা তাঁর কাছে সকাল বেলাতেই পৌঁছে গেছে।'

রাহেলা ঢোঁক গিললেন, 'আমার লিমিটেশনটা কোথায়, কেন আমার পক্ষে সব বলা সম্ভব নয়—'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল অশোক, 'ফরগেট ইট মিস্টার রাহেলা। আমি সবই বুঝতে পারি।'

একটু চুপ। তারপর অশোকই শুরু করল, 'চ্যাটার্জি সাহেব চমকে যাবার মতো দুর্দান্ত একটা খবরও দিয়েছেন।'

'কী খবর স্যর?' রাহেজার চোখে-মুখে অনন্ত আগ্রহ।

'দু'দিন ছুটির পর থার্ড ডে'তে হাই-পাওয়ার কমিটির সেই মিটিংটা ঠিক করা হয়েছে।'

'তা তো জানি। নতুন কিছু খবর নয়—'

'ঠিক। কিন্তু ওই মিটিংয়ের সঙ্গে অ্যাডিশনাল আরও কিছু আছে তা আপনার জানা নেই।'

'কী সেটা?'

'আমি যে এই হাউসে একটা মিশন ফুলফিল করতে এসেছি এটা পুরনো খবর, প্রিন্ট মিডিয়া এত প্রমিনেন্টলি তা প্রকাশ করেছে যে, দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড ছাড়াও বহু মানুষ তা জেনে গেছে। চ্যাটার্জি সাহেব অ্যাডিশনাল যা জানিয়েছেন তা এইরকম। যে পারপাসে আমার এই হাউসে আসা, তা খুব সহজে করা যাবে না। রীতিমতো যুদ্ধ করেই সেটা করতে হবে। যুদ্ধের শুরু নাকি ওই হাই-পাওয়ার কমিটির আর্জেন্ট মিটিং থেকেই।'

'কীসের যুদ্ধ?'

'চ্যাটার্জি সাহেবকে জিগ্যেস করেছিলাম। উনি বলেছেন সেটা মিটিংয়ে গেলেই জানা যাবে। কী ধরনের লড়াই আপনি কি গেস করতে পারেন?'

'না স্যর।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন রাহেজা, 'নো আইডিয়া। তবে এটা মনে হচ্ছে ওই মিটিংয়ে সিরিয়াস কিছু ঘটতে পারে।'

'ইন ফ্যাক্ট, আমারও তাই মনে হয়েছিল। বজবজ থেকে ফেরার পর শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল ঠিকই, তবু মিটিংটা আমি অ্যাটেন্ড করতে যে না পারতাম তা কিন্তু নয়। স্রিপ যে করলাম তার কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'আমি বজবজে গেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে বিলিমোরিয়া সাহেবরা আচমকা মিটিং ডেকে বসলেন, এই দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও সম্পর্ক আছে। কেন যে ঠিক কী, ধরতে পারিনি, এখনও পারছি না।'

রাহেজা উত্তর দিলেন না।

অশোক কিছু ভাবছিল। বলল, 'ওইরকম একটা মিটিং ডাকা হল আর আমি হুট করে চলে গেলাম, সেটা ঠিক হতো না। সে জন্যে মেন্টাল প্রিপারেশনের দরকার। যাই হোক দুটো দিন ছুটি নিয়েছি। অনেকটা সময়। এর ভেতর আর্জেন্ট বা এক্সট্রা-অর্ডিনারি মিটিংটার ব্যাপারে নানা দিক থেকে ভেবে দেখতে হবে। আপনিও একটু ভাববেন মিস্টার রাহেজা।'

'নিশ্চয়ই স্যর—'

সামান্য নীরবতা।

তারপর হঠাৎই অশোকের যেন কিছু মনে পড়ে গেল। ব্যস্তভাবে বলল, 'বজবজে ওয়ার্কারদের কোয়ার্টারগুলোর ছবির কথা বলেছিলাম—'

রাহেজা বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে ফোন করে ফোটোগ্রাফারদের বলে দিয়েছি। পরশু দুপুরে ওরা ফটোগুলো দিয়ে যাবে।'

এই হাউসে আসার পর থেকেই অশোক লক্ষ করেছে চন্দ্রকান্ত রাহেজা একজন অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি। যখন যে অ্যাসাইনমেন্ট তাঁকে দেওয়া হয় সেটা নিপুণভাবে করে থাকেন। আচমকা স্ত্রী কলিক পেইনে অসুস্থ হয়ে পড়লেও ফোটোগ্রাফারদের কথা ভোলেননি। অশোক বলল, 'থ্যাংক ইউ। প্রত্যেকটা ছবি পাঁচ ছ'কপি করে চাই।'

'তাই পাবেন স্যর—'

হাই-পাওয়ার কমিটির আর্জেন্ট মিটিংটা আজকের মতো মস্তিষ্ক থেকে বের করে দিয়ে এলোমেলো নানা টপিক নিয়ে হাল্কা চালে কিছুক্ষণ কথা হল।

রাত আরেকটু বাড়লে অশোক বলল, 'অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, এবার আপনি নীচে যান। আমিও ডিনারটা শেষ করে ওষুধ-টোষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ব। ঘুম পাচ্ছে। গুড নাইট।'

দু'জনে ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে হলঘরে লিফট্ বক্সের দিকে এগিয়ে গেল।

॥ দশ ॥

টালিগঞ্জে মাঙ্গিরাম লাখোটিয়ার বস্তি বাড়িটায় থাকার সময় কোনওদিন ঘুমের লেশমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। বিছানায় গা ঢেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে ঘুম ঝাঁপিয়ে পড়ত। কোনওরকম চাপ নেই, দুশ্চিন্তাও ধারেকাছে ঘেঁষে না। সেই জীবনটা ছিল অন্য ধাঁচের। বেজায় ফুরফুরে, আগাগোড়া কেয়ারফ্রি। একবার শুয়ে পড়লে সেই ঘুম ভাঙতে ভাঙতে পরের দিন বেলা দুপুরের দিকে গড়াত। কিন্তু এই হাউসে আসার পর ঘুম ঘুম টঙে উঠেছে। এখন মাথায় কত যে প্রেশার। চাপমুক্ত হয়ে একটু ঘুমের জন্য শোবার আগে দুটো ট্যাবলেট খেতে হতো। আজ তার সঙ্গে এক্সট্রা আরও একটা ডক্টর দন্তগুপ্ত জুড়ে দিয়েছেন।

একটা প্রেশার, একটা সুগার এবং একটি শক্তিধর ঘুমপাড়ানি ট্যাবলেট খাওয়ার পরও আজ ঘুম আসার লক্ষণই নেই। সেই চিন্তাটা ফের ফিরে এসেছে। শুধু তাই না, এই নির্জন বেডরুমে পাথরের চাইয়ের মতো ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে। দু'দিন পরের সেই আর্জেন্ট মিটিংয়ে কী ঘটতে পারে? কী ধরনের যুদ্ধ?

আকাশপাতাল ভেবেও তলকূল পাওয়া যাচ্ছে না। কপালের দু'পাশের রগগুলো দপদপ করছে।

মাথরাত পেরিয়ে গেল। ওল্ড বালিগঞ্জ ঘুমের আরকে ডুবে গেছে। চারদিক নিঝুম। কচিৎ কখনও রাত-জাগা পাখির ডাক আর দু'একটা রাতচরা গাড়ির দূরন্ত গতিতে ছুটে যাওয়ার আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই।

অশোক বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেই চলেছে। আরও খানিকটা সময় কেটে যায়। হঠাৎ শেষ রাতের দিকে মস্তিষ্কে ঝিলিক শেষে গেল। যুদ্ধের কারণটা কী এতক্ষণে তা অনেকটাই ধরা যাচ্ছে। আশ্চর্য, অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।

অপার স্বস্তি। কপালের দু'পাশের রগগুলো আর লাফাচ্ছে না; টেনশনটাও উধাও। চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল।

শেষ রাতের ঘুমটা কিন্তু ভাঙল পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায়। সঙ্গে সঙ্গে বেড-টি চলে এল। সেটা শেষ হতে না-হতেই চীনা তরুণীটি হাজির। তার সঙ্গে সটান বাথরুমে। তারপর ম্যাসাজ আর স্নান সেরে পোশাক পাল্টে ডাইনিং রুমে।

এই হাউসে এসে অশোক যে যান্ত্রিক লাইফস্টাইলে ঢুকে পড়েছে কাল শেষ রাত অবধি জেগে থেকেও তার বিন্দুমাত্র হেরফের হল না।

এ বাড়িতে রোজ ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে পাঁচ-ছ'টা ডেইলি নিউজ পেপার আসে। ব্রেকফাস্ট চুকে গেলে অন্যদিনের মতো ড্রইংরুমে গিয়ে অশোক সবে একটা কাগজ হাতে তুলে নিয়েছে, রাহেলা চলে এলেন। 'গুড মর্নিং স্যর—'

অশোকও তাঁকে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে বলল, 'বসুন, বসুন—'

রাহেলা খানিকটা দূরে একটা সোফায় বসলেন। অশোক যতই তাঁকে বন্ধু মনে করুক, পদমর্যাদায় সে কতটা উঁচুতে এক লহমার জন্যও তিনি তা ভোলেন না। তাই এই দূরত্ব।

অশোক জিগ্যেস করল, 'আজ মিসেস রাহেলা কেমন আছেন?'

'অনেক ভালো। কলিকের যন্ত্রণাটা আর নেই বললেই হয়।'

'সুসংবাদ। আশা করি মিসেস তাড়াতাড়ি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠুন।'

'আপনার শুভেচ্ছায় তাই হবে। অনেক ধন্যবাদ স্যর—'

কাল প্রায় সারাটা দিন ছোটাছুটি আর প্রচণ্ড ছোটাছুটির মধ্যে কেটেছে অশোকের। আজ তাকে খুব হাসিখুশি আর চাপমুক্ত দেখাচ্ছে। অনেক রাত অবধি কাল চেয়ারম্যান কাম এমডি'র সঙ্গেই ছিলেন রাহেলা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার কোন ভোজবাজিতে এতটা পরিবর্তন ঘটে গেল, আঁচ করা যাচ্ছে না। এ নিয়ে তো হাউসের সর্বেসর্বাকে আর প্রশ্ন করা যায় না। রাহেলা একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলেন।

অশোক বলল, 'মিস্টার রাহেলা মিসেসের ব্যাপারে আপনি একটা ভালো খবর দিয়েছেন। আপনাকেও একটা সুসংবাদ দিচ্ছি—'

রাহেলা চুপ। এত অল্প সময়ের মধ্যে কী এমন সুখবরের সৃষ্টি হল, বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর কৌতূহলের মাত্রাটা বেড়ে গেল।

অশোক বলতে লাগল, 'সোমদেব চ্যাটার্জি বলেছেন, দু'দিন বাদে হাই-পাওয়ার কমিটির মিটিংয়ে আমার আসল যুদ্ধ নাকি শুরু হবে। কীসের যুদ্ধ, কেন যুদ্ধ, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে কাল রাতটা প্রায় কাবাব করে দিয়েছিলাম। তখনই বোঝা গেল যুদ্ধটা কী কারণে। ব্যাটেনফিল্ডে তো আমাকে ঢুকতেই হবে। কিন্তু ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, লড়াইটা করব কী করে? হাই-পাওয়ার কমিটির চারজন বাঘা বাঘা মেম্বার আমাকে ছিঁড়ে খাবে। আর তখনই মনে পড়ল, আরে, আমার হাতে তো একটা মারাত্মক ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে। ব্যস, টেনশন উধাও। বাকি রাতটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারলাম।'

এবার রাহেলাকে কেমন যেন হতভম্ব দেখাল।

ভুরু দু'টো উঁচুতে তুলে লঘু সুরে অশোক বলল, 'কী অত ভাবছেন? ব্রহ্মাস্ত্রটা টুপ করে আমার হাতে এসে পড়ল কী করে? ইন ফ্যাক্ট ওটা আপনিই আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।'

'আমি—মানে—' রাহেলা বারকয়েক ঢোক গিললেন। তাঁর মাথার ভেতরটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

অশোক তাঁর মনোভাবটা আঁচ করে বলল, 'হাই-পাওয়ার কমিটির মিটিংটা শেষ হোক। তারপর আপনার সব কৌতূহল মিটে যাবে। এই ব্যাপারটা এখন থাক। অন্য একটা ভেরি ভেরি ইমপর্টান্ট টপিক নিয়ে আপনার সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই। আসলে আমার কিছু ইনফরমেশন প্রয়োজন। আশা করি, আপনার কাছে পাওয়া যাবে।'

'আমার জানা থাকলে নিশ্চয়ই পাবেন স্যর।'

'ধন্যবাদ।'

ইমপর্টান্ট টপিকটা নিয়ে আলোচনাটা আপাতত শিকেয় তুলে রাখতে হল। কেননা, লীনা দেশাই কার্লেকারকে সঙ্গে নিয়ে ফের দর্শন দিল। স্যর হরকিষণ দেশাইয়ের মেয়েকে ড্রইংরুমে ঢোকামাত্র তো বিদায় করা যায় না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের এক মহাতারকা স্যর হরকিষণ। সোসাইটিতে তাঁর বিপুল প্রভাব।

মেজাজটা তিতকুটে হয়ে গিয়েছিল অশোকের। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলতে হল, 'বোসো, বোসো—'

লীনারা বসে পড়ল।

অশোক জিগ্যেস করল, 'টি অর কফি—'

লীনা বলল, 'ও সব পরে হবে। শুনলাম, তুমি নাকি কাল তোমাদের ক'টা ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের কোয়ার্টারগুলো দেখতে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম। তুমি কী করে জানলে?'

'জানব না! হোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড জেনেছে। এটা তো টক অফ দ্য টাউন।'

'আই সি—'

'আমাকে একটা ফোন করলে তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতাম। সাধারণ ওয়ার্কাররা কোথায়, কী পরিবেশে থাকে, সেটা দেখা যেত। আমেরিকার সেমিনারে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা বলতে পারতাম। আমার ইমপর্টান্সটা অনেক বেড়ে যেত। একটা বড় চান্স মিস করলাম।'

'সরি, হঠাৎই চলে যেতে হল তো। তাই—'

'ওকে, ওকে, আমি কী জন্যে এসেছি, মোস্ট প্রবেবলি বুঝতে পারছ!'

'মোস্ট প্রবেবলি নয়, মিস্টার কার্লেকার যখন সঙ্গে এসেছেন, মোস্ট সার্টেনলি বুঝে গেছি।'

লীনা জিগ্যেস করল, 'পাশপোর্টের ব্যাপারটা কী করলে?'

'এই তো পরশু দিন না কবে যেন এলে। আমাকে ভাবার জন্যে এক উইক না দশ দিন সময় দিয়ে গেলে। আজই আবার—'

ঝাঁঝালো গলায় লীনা বলল, 'যতটা সময়ই দিই না কেন, আমি কি যেদিন ইচ্ছে আসতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই পার।'

'তুমি ভীষণ অবস্টিনেট। বার বার এসে এসে তোমার মাথায় হ্যামার না চালালে কাজ হবে না। পাসপোর্টের ব্যাপারে কী ঠিক করলে?'

'তোমাকে তো বলেইছি, আমেরিকা আর ইউরোপে যাওয়ার ইচ্ছে বা লোভ কোনওটাই আমার নেই। কেন এত ইনসিস্ট করছ?'

'তোমার মতো সিলি একটা মানুষ আগে কখনও দেখিনি। ওই দুটো কন্টিনেন্টে তোমার যাওয়াটা খুব দরকার। দেখবে তোমার ভাবনাচিন্তা সব পাল্টে যাবে। লাইফটা কীভাবে এনজয় করা যায় শিখতে পারবে। পাসপোর্টটা করে নাও—'

স্যর হরকিষণ দেশাইয়ের খামখেয়ালি মেয়ে গোঁ ধরেছে, বব্বির একটা ছেলেকে টেনে-হেঁচড়ে আমেরিকা আর ইউরোপে নিয়ে যাবেই। অশোক মনে মনে বলল, 'তোমরা সোসাইটির সবচেয়ে উঁচু লেভেলের মানুষ, আমি একেবারে সবচেয়ে নিচু লেভেল থেকে এসেছি। আমাদের ক্লাস আলাদা। আমাদের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। আমাকে এত টানাটানি কেন? নিজেদের ক্লাসের কারওকে ধরে নিয়ে যাও না বাবা। আমেরিকা-ইউরোপে আমাকে নিয়ে গিয়ে কি বাঁদর নাচ নাচতে চাইছ?' মুখে বলল, 'আমি যে না যাওয়ার ডিসিশন নিয়েছি, আগেই তা বলে দিয়েছি। প্লিজ আমাকে ছেড়ে দাও—'।

কে কার কথা শোনে। দুপুর পর্যন্ত হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে লীনারা চলে গেল। যাবার আগে শাসালো, ছাড়াছাড়ি নেই। দু'একদিনের মধ্যে ফের হানা দেবে।

রাহেজা চুপচাপ বসে ছিলেন। যতক্ষণ লীনারা ছিল তাঁর মুখ থেকে টুঁ শব্দটিও বেরয়নি। স্যার হরকিষণ দেশাইয়ের মেয়ে যখন ঝড়ের গতিতে কথা বলে তখন রাহেজার মতো এমন্নয়িকে মুখ বুজে থাকতেই হয়। যদিও লীনারা অন্য একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের মালিক।

অশোক একটু হাসল, 'মিস্টার রাহেজা, স্যর হরকিষণের মেয়ে একেবারে সাইক্লোন বইয়ে দিয়ে গেল। পাক্কা তিনটে ঘণ্টা টোটালি ওয়েস্টেড। এবেলা আর হবে না। বিকেলে সেই টিপিকাল নিয়ে আবার বসব।' স্বগতোক্তির মতো চাপা গলায় নিজেকে শুনিয়ে বলল, 'মেয়েটা জোঁকের মতো লেগে আছে। কী করে যে ছেঁটে ফেলব!'

লাঞ্চের পর ঘণ্টাতিনেক ঘুমিয়ে নিল অশোক। এই হাউসে আসার পর রবিবারে বা অন্য কোনও ছুটির দিনেও দুপুরের ঘুমের কথা ভাবাই যায় না। বাইরে নানা টাইপের প্রোগ্রাম থাকে। রাজভবনে বা কোনও বিদেশি দূতাবাসে লাঞ্চ লেগেই আছে। নানা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা বা পাঁচতারা হোটেলের ব্যাঙ্কয়েট হলে চেম্বার অফ কমার্সগুলোর ডাকে কনফারেন্সগুলোতেও হাজিরা দিতে হয়। সব জায়গাতেই লাঞ্চের ব্যবস্থা। গুল্ড বালিগঞ্জে ফিরতে ফিরতে বিকেল প্রায় ফুরিয়ে আসে। দিনের শেষ বেলায় ঘুমোলে শরীর চিস চিস করে। তাই ঘুমটা বাদ।

মাঙ্গিরাম লাখোটিয়ার বস্তি থেকে এই হাউসে আসার পর এটাই তার প্রথম পারফেক্ট দিবানিদ্রা। সারা শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে।

বাথরুম থেকে ফিরে সটান ব্যালকনিতে চলে এল অশোক। তার আগেই রাহেজা এসে বসে আছেন।

রাহেজা উঠে দাঁড়ালেন, 'গুড আফটারনুন স্যর।'

শুভ অপরাহ্ণ জানিয়ে অশোক বলল, 'এ কী, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন বসুন—' হাউসের সর্বময় কর্তাকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়ানোটা দস্তুর। অশোক অনেকবার এভাবে দাঁড়াতে বারণ করেছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। দস্তুরটা তিনি মানবেনই।

দু'জন বসে পড়ল।

অশোক জিগ্যেস করল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'অ্যাবাউট হাফ অ্যান আওয়ার।'

'খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। সরি—'

'না, না স্যর, ওভাবে বলবেন না। এই হাউসে আসা থেকে আপনার যে টেনশন চলছে তাতে এরকম ঘুম খুব জরুরি।'

শশব্যস্ত বেয়ারার দঙ্গল হলঘরের একধারে অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে দু'জন কফি, প্রচুর ড্রাইফ্রুট আর নানা বিদেশি কোম্পানির বিস্কিট দিয়ে গেল।

অশোক বলল, 'তখন যা বলতে যাচ্ছিলাম, স্যর হরকিষণ দেশাইয়ের মেয়ে এসে সেটা একদম ঘেঁটেঘুঁটে দিয়েছে। এখন তা শুরু করা যাক।' বলে কফির মগ হাতে তুলে নিল।

রাহেজা কিছু বললেন না। নিবিষ্ট শ্রোতার মতো বসে রইলেন।

কফিতে হালকা একটা চুমুক দিয়ে অশোক শুরুটা এভাবে করল, 'আমরা সোসাইটির উন্নয়নের কথা বলি। ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাই। আমার মনে হয়েছে মানুষের আর্থিক উন্নয়ন ছাড়া সেটা আদৌ সম্ভব নয়। আপনি হাইলি কোয়ালিফায়েড, এফিসিয়েন্ট আর ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট একজন মানুষ। আমি অ্যানটপকা একটা ইনক্লেডিবল ড্রামাটিক ঘটনায় এই হাউসের চূড়োয় এসে বসেছি। আর আপনি কি না আমার সেক্রেটারি। ভীষণ কনট্রাডিক্টরি। আমার জায়গায়

আপনি থাকতে পারতেন। আপনার জায়গায় আমি। আর—'

হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে রাহেজা বললেন, 'এ আপনি কী বলছেন স্যর! কাইন্ডলি এসব বলবেন না।' মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর প্রায় মেঝেতে নুয়ে পড়ার মতো অবস্থা।'

'যা বলেছি, ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট টু। আপনার এত সংকোচের কারণ নেই। মাথা উঁচু করে বসুন। যে কথা হচ্ছিল, আপনার মনে হয় না, দেশের প্রত্যেকটা মানুষের আর্থিক দিক থেকে সেল্‌ফ সাপোর্টিং হওয়া দরকার। তবেই তো সোসাইটির চেহারা বদলে যাবে। স্বাধীন ভারতে এমন প্রত্যাশাই তো ছিল। কিন্তু ইন্ডিপেনডেন্সের পর দু'টো ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পার হয়ে গেছে। কতজনের কাজকর্ম জুটেছে? পপুলেশন যত বাড়ছে সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আন-এমপ্লয়মেন্ট। চাকরি-বাকরি বা অন্য কাজকর্মের সুযোগ না থাকলে সোসাইটি পাল্টাবে না। ডু ইউ এগ্রি?'

আস্তে মাথা নাড়েন রাহেজা।

আচমকা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল অশোক, 'শুনেছিলাম আমাদের হাউস এই স্টেটে ইন্ডাস্ট্রির জন্যে প্রচুর জমি কিনে রেখেছে। এটা কি ঠিক?'

এসব কেন জানতে চাইছে অশোক? অবাকই হলেন রাহেজা, 'হ্যাঁ স্যর—'

'কত জমি কেনা হয়েছে?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার ধারণা চার থেকে সাড়ে চার হাজার একরের মতো।'

'কোন কোন ডিস্ট্রিক্টের জমি কেনা হয়েছে জানেন?'

'না স্যর।'

'কোনওভাবে জানা যায়?'

অশোক এই হাউসের চেয়ারম্যান-কাম-এমডি। জেনারেল ম্যানেজারকে কোন করলে এক মুহূর্তে জেনে যেতে পারে। তবু তাঁর মতো সাধারণ এমপ্লয়িকে কলকারখানার জমি নিয়ে এত সব প্রশ্ন কেন? রাহেজার বিস্ময়টা বেড়েই যাচ্ছে।

তাঁর মনোভাবটা আঁচ করতে পারছিল অশোক। বলল, 'আমার যে এই ইনফরমেশনটা দরকার, আপাতত সেটা গোপন রাখতে চাই।'

কেন এই গোপনীয়তা বুঝতে পারছেন না রাহেজা। এ নিয়ে হাউসের সবচেয়ে ক্ষমতাবানকে তো প্রশ্ন করা যায় না। বললেন, 'যারা ইন্ডাস্ট্রি-রিলেটেড ল্যান্ড-ট্যান্ডের ব্যাপারগুলো দেখে সেই ডিপার্টমেন্টের একজন টপ অফিসার আমার বন্ধু। তার কাছ থেকে জানা যেতে পারে।'

'দু'একদিনের মধ্যে ওই ইনফরমেশনটা আমার চাই। কিন্তু আমি যে এর মধ্যে আছি, আপনার বন্ধু যেন জানতে না পারেন। খুব ট্যাক্টফুল কাজটা করতে হবে।'

'ঠিক আছে স্যর, আপনি যেমন বললেন সেভাবেই কাজটা করব। কাল-পরশুর ভেতরেই ডিটেলে সব জোগাড় করে ফেলব।'

॥ এগারো ॥

দু'দিন পর অফিসে এসে অশোক হাইপাওয়ার কমিটির কনভেনর বিলিমোরিয়াকে প্রথম ফোনটা করল, 'গুড মর্নিং, আর্জেন্ট মিটিংটা কখন ডেকেছেন।' ঘড়িতে এখন দশটা। দুপুর হতে দু'ঘণ্টা দেরি। তাই গুড মর্নিং।

বিলিমোরিয়া বললেন, 'ভেরি গুড মর্নিং। সেদিন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এখন সুস্থ তো?'

'পারফেক্টলি।'

'কোনও সমস্যা নেই?'

'নট অ্যাট অল। সেদিন আপনারা যা করেছেন, আই শ্যাল নেভার ফরগেট। যতদিন বেঁচে আছি মনে থাকবে। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।'

'না, না, যা করেছি সেটুকু তো করতেই হয়। আপনি এই হাউসের উপমোস্ট পার্সন। আপনার সুস্থ থাকটা হাউসের পক্ষে ভীষণ জরুরি।'

'মেনি থ্যাংকস। এবার কাজের কথায় আসা যাক। আর্জেন্ট মিটিংটা কখন ডাকা হয়েছে?'

'দু'টোয় আপনার প্রেস মিট। তাই আমাদের মিটিংটা বারোটায় ডেকেছি। এই টাইপের মিটিংয়ে হাইপাওয়ার কমিটির চেয়ারম্যান আপনি আর আমরা চারজন মেম্বার ছাড়া অন্য কেউ অ্যালাউড নয়। আপনার সেক্রেটারি রাহেজা আপনাকে কনফারেন্স রুমের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে যাবেন। মিটিং শেষ হলে তাঁকে ফোন করা হবে। তিনি আপনাকে আপনার চেম্বারে নিয়ে যাবেন।'

'ঠিক আছে।'

অশোক ফোন নামিয়ে রাখল। সে চেম্বারে ঢোকার পর থেকে পার্লে যে পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে আছে সে লক্ষ করেনি।

পার্লে মৃদু গলায় ডাকল, 'স্যর—'

অশোক তার দিকে ঘাড় ফেরায়, 'ইয়েস। কিছু বলবেন মিস শেঠনা—'

'আপনার জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছিল। একবার ভেবেছিলাম, ওল্ড বালিগঞ্জে গিয়ে দেখে যাবে আসি।'

চমক লাগল অশোকের। পার্লের কণ্ঠস্বরটা অন্যরকম লাগছে। তবে কী, তবে কী—নিজেকে ভেতরে ভেতরে সতর্ক করে নিল সে। হেসে হেসে হাল্কা গলায় বলল, 'গেলেই পারতেন।'

'ভয় হচ্ছিল। আপনার বিল্ডিংয়ের গেটকিপাররা কমপাউন্ডের ভেতরে ঢুকতে দেবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম, ফোন করে আপনার খবর নেব—'

'ফোন করলেন না কেন?'

'সাহস হয়নি। যদি আপনি বিরক্ত হন—'

অশোকের একটু মজাই লাগল, এই হাউসে আসার পর আরও অনেকের সঙ্গে বাড়তি প্রাপ্তি দু'জন। লীনা এবং পার্লে শেঠনা। লীনা প্রথম দিন দেখা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ পজেসিভ। স্যর হরকিষণ দেশাইয়ের মেয়ে যা চায়, তা দখল করে নিতে পারে। মরাত্মক বেপরোয়া, চরম দুঃসাহসী। কিন্তু পার্লে শেঠনা, তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টটি খুবই স্মার্ট, ঝকঝকে। কাজকর্মে এতটুকু ত্রুটি নেই, ভীষণ চটপটে। এটা তার বাইরের দিক। ভেতরে কী চলছে এতদিন বোঝা যায়নি। মিডল ক্লাস ফ্যামিলির কোনও তরুণীর মতো খুব সম্ভব শান্ত, ভীরু, ভেতরে ঝড় উঠলে সে গোপন করে রাখতে জানে। কিন্তু আজ তার হালকা, মৃদু একটা আভাস যেন আচমকা বেরিয়ে এসেছে।

খেলাটা মন্দ নয়। অশোক বলল, 'বিরক্ত হব কেন? ফোনটা করলেই পারতেন।'

পার্লের মুখেচোখে আবছা আলোর মতো কী যেন খেলে গেল।

আর এগতে দেওয়া ঠিক হবে না। লাটাইতে সুতো গুটানোর পালা। অশোক বলল, 'নাউ অন টু বিজনেস মিস শেঠনা।' তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, সংযত, সামান্য গম্ভীর।

পার্লের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'আপনাকে আজ খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে—' থমকে হকচকিয়ে গেল সে। গলাটি চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের।

পার্লে নিজেকে লহমায় গুটিয়ে নিয়েছে। নিচু গলায় বলল, 'ইয়েস স্যর—'

'এই দু'দিনে আমার কোনও ফোনটোন এসেছিল?'

বেশিরভাগই তেমন ইমপর্টান্ট নয়। বাকিগুলো যাঁরা করেছেন তাঁদের নাম আর ফোন নাম্বার লিখে একটা লিস্ট করে আপনার টেবিলে রেখে দিয়েছি। নিজের সিট থেকে উঠে এসে পেপার ওয়েটে চাপা দেওয়া টাইপ-করা একটা কাগজ অশোকের সামনে রেখে গেল।

অশোক দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। এদের পরে রিং ব্যাক করলেও চলবে। কার্যকারণ নেই, হঠাৎই রমেশ অধিকারীর কথা

মনে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে রেখাকেও। আশ্চর্য, একটু আগে তার ভাবনাচিন্তা জুড়ে ছিল লীনা আর পার্লা। একবারও টালিগঞ্জের বস্তিবাসিনী সেই মেয়েটার কথা দু'টো দিন মাথায় আসেনি, অথচ সেই কোন কিশোর বেলা থেকে রেখা তার শ্বাস-প্রশ্বাসে জড়িয়ে আছে। তার কথা এই দু'দিন একবারও ভাবেনি। রমেশ অধিকারীকেও নয়। ছুটির প্রথম দিনেই তো সে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। এক ফাঁকে কি টালিগঞ্জে যাওয়া যেত না? অন্যায়, অন্যায়।

অশোক জিগ্যেস করল, 'রেখা বোস নামে কেউ কি ফোন করেছিল?'

পার্লের স্মৃতিশক্তিটা বেশ ভালো। বলল, 'হ্যাঁ স্যর, লিস্টে তাঁর নাম আছে।'

অশোক লিস্ট তুলে নিল। আগেরবার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, এবার চোখে পড়ল। তালিকাটা নামিয়ে রেখে জিগ্যেস করল, 'ইনি কি আমার জন্যে কোনও মেসেজ টেসেজ দিতে বলেছেন?'

পার্ল চমকে উঠল, মিয়ানো গলায় বলল, 'হ্যাঁ দিয়েছেন, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি—'

'আগে বলুন মেসেজটা কী—' অশোকের গলার স্বর কঠিন শোনাল।

'উনি বলেছেন রমেশ অধিকারী নামে একজন স্কুল টিচার স্ট্রোকে বেড রিডন হয়ে আছেন। ট্রিটমেন্ট চলছে, কোনওরকম ইমপ্রুভমেন্ট নেই।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ স্যর, রেখা বলেছেন, উনি টালিগঞ্জে একটা বস্তিতে থাকেন। এটা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন। পরে উনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

'এসব বলেননি কেন? স্ট্রেঞ্জ—'

মাথা নিচু করে রইল পার্ল।

অশোক বলল, 'বি কেয়ারফুল। বুঝতে পারছি, রেখা বোস বস্তিতে থাকে বলে এ ব্যাপারে সেভাবে ইমপর্টান্স দেননি। আপনি কি জানেন, আমিও স্লাম-ডোয়েলার? আমার রুটও বস্তিতে।'

'স্যর, অন্যায় করে ফেলেছি। এরকম আর কখনও হবে না।'

এ নিয়ে আর কিছু বলল না অশোক।

দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী নানা ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার এবং টপ অফিসাররা এসে অশোককে দিয়ে প্রচুর কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে যান। আজও তার হেরফের হল না। দু'দিন আগে অশোক যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং সেজন্য ছুটিও নিতে হয়েছে, খবরটা সারা অফিসে চাউর হয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার এবং অফিসাররা এসে চেম্বারের বাইরে ভিড় জমাতে লাগলেন। অন্যদিনের মতো এক একে তাঁরা ভেতরে ঢুকে অশোক যে সুস্থ হয়ে উঠেছে, জেনে নিয়ে সসম্ভ্রমে শুভেচ্ছা জানিয়ে সইটই করিয়ে যেতে লাগলেন।

বারোটা বাজতে যখন সাত মিনিট বাকি, রাহেলা চলে এলেন। আর্জেন্ট মিটিং ঠিক কখন শুরু হবে, সময়টা তাঁর জানা। বললেন, 'স্যর এবার যেতে হবে।'

অশোক উঠে পড়ল। বাইরে তখনও বেশ কয়েকজন ম্যানেজার এবং অফিসার অপেক্ষা করছেন। চেম্বার থেকে বেরিয়ে বিনীতভাবে সে তাঁদের 'আই অ্যাম সরি, আজ আর হল না। প্লিজ আপনারা কাল আসুন—'

'আচ্ছা স্যর—'

রাহেলাকে সঙ্গে নিয়ে লিফটে নীচের ফ্লোরে কনফারেন্স হল-এ চলে এল দু'জনে।

রাহেলা ভেতরে গেলেন না। হাই পাওয়ার কমিটির যে কোনও মিটিংয়ের সময় কমিটির মেম্বার এবং চেয়ারম্যান ছাড়া অন্য কারও কনফারেন্স হল-এ যাওয়া নিষেধ। হল-টার গা ঘেঁষে একটা সাজানো-গোছানো ওয়েটিং রুম। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে রাহেলা বলল, 'আমি স্যর ওখানে ওয়েট করছি।'

ভুরু দুটো অনেকটা উঁচুতে তুলে মজাদার একটা ভঙ্গি করে অশোক বলল, 'আমি বর্ষাভূমি, আই মিন স্লটার হাউসে ঢুকছি। দেখা যাক পিতৃদত্ত প্রাণটা বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পারি কি না—'

॥ বারো ॥

কনফারেন্স হল'টা বিশাল। সেটার একধারে খানিকটা এলাকা ঘিরে হাই-পাওয়ার কমিটির মিটিং হয়।

কমিটির মেম্বারদের সংখ্যা তো খুব বেশি নয়। চেয়ারম্যানকে নিয়ে কোনও বছর সেটা পাঁচজন হয়, কোনও বছর সাতজন। এর বেশি কখনওই নয়। এটা আগেই জেনে গেছে অশোক।

কনফারেন্স হল-এর এই অংশটার ফ্লোর জুড়ে পার্সিয়ান কার্পেট। মেহগনি কাঠের একটা মহার্ঘ মস্ত নিচু সেক্রেটারিয়েট টেবিলের একধারে চেয়ারম্যানের জন্য দামি সোফা। টেবিলের বাকি তিন দিক ঘিরে মেম্বারদের জন্যও একই রকম সোফা।

অশোক সেখানে চলে এল। মেম্বাররা আগেই এসে অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে জমকালো বাংলায় যাকে বলে রাজকীয় অভ্যর্থনা করা, ঠিক সেইভাবে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন, 'নমস্তে', 'নমস্কার', 'আসুন আসুন ব্যানার্জিসাহেব।'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে ঘড়ি দেখে অশোক বলল, 'বারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি। লেট হইনি, কী বলেন?'

সবাই হা হা করে উঠলেন, 'কী যে বলেন। আপনি সবসময় ব্রিটিশ পাংচুয়ালিটি মেনে চলেন। বসুন স্যর, বসুন—'

অশোক চেয়ারম্যানের গদিতে গিয়ে বসল, 'বলুন আজকের এই ভেরি ভেরি আর্জেন্ট মিটিংটার কী টপিক?'

আগরওয়াল বললেন, 'সে সোব পরে হোবে। আমরা আগেই খোবর পেয়েছি, আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তবু আপনাকে পুছ করছি, কেমুন আছেন? তবিয়ত পারফেক্ট তো?'

এর আগেও আজ এই প্রশ্নটা আরও অনেকে করেছে। হেসে হেসে অশোক বলল, 'পারফেক্ট মিস্টার আগরওয়াল। চিন্তা করবেন না।'

ভট্টাচারিয়া বললেন, 'আপনি যে ফের অফিসে চলে এসেছেন, এটা হাউসের পক্ষে বিরাট স্বস্তি।'

তোষামোদ আর হাইপোরবোলকে কোন শিল্পের লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় এদের না দেখলে জানা যেত না। মনে মনে অশোক বলল, 'চাঁদবদনেরা, গ্যালন গ্যালন তেল তো ঢালছ, কখন ছুরিটা বের করবে?'

তার শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর চলল। তারপর বিলিমোরিয়া বললেন, 'দুটোয় আপনার তো প্রেস কনফারেন্স আছে। এখন তা হলে যে কারণে এই মিটিং ডাকা হয়েছে, তা শুরু করা যাক।'

অশোক মাথা নাড়ল, 'অবশ্যই—'

'আমরা জানতে পেরেছি, দু'দিন আগে আপনি বজবজে আমাদের তিনটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটের ওয়ার্কারদের কোয়ার্টারগুলো দেখতে গিয়েছিলেন।'

কোন উদ্দেশ্যে এই অত্যন্ত জরুরি মিটিংটি ডাকা হয়েছে, তার হালকা, ক্ষীণ একটা আভাস সে আগেই পেয়েছিল কিন্তু নিশ্চিত ছিল না। আজ সেটা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সোমদেব চ্যাটার্জি ফোনে বলেছিলেন এই মিটিং নাকি ব্যাটলফিল্ড—রণক্ষেত্র। খুব সম্ভব এই হাউসে আসার পর এটাই তার প্রথম সংঘাত। নিজেকে সতর্ক করে নিল সে। চারজন ঘাঘু মেম্বার আক্রমণটা কোন দিক থেকে শানাবেন, সেটা দেখাই যাক। শুরুতেই বিচলিত বা উত্তেজিত হয়ে পড়লে চলবে না। মস্তিষ্ককে হিমশীতল রাখতে হবে। খুব শান্ত গলায় অশোক বলল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আমার ধারণা আমি সেখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা তা জেনে গেছেন। ঠিক বলছি?'

বিলিমোরিয়া থতমত, 'এই, মানে—'

বিরুদ্ধ পক্ষ রাইফেল তুলে নেবার আগেই আত্মরক্ষার জন্য সেই কাজটা নিজেকেই করতে হবে। 'অফেন্স ইজ দ্য ডিফেন্স'—সেটা ফাঁকা আওয়াজ নয়। বন্দুকের বল থেকে একটা বুলেট যখন বেরিয়েই গেছে, আরেকবার ট্রিগারটা টেপাই যাক। শুরুতেই প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলাটা জরুরি। অশোক আগের মতোই ঠান্ডা গলায় বলল, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলোতে আপনাদের গুপ্তচর বাহিনী, মানে স্পাইরা আছে বলেই মনে হয়—'

মোক্ষম ঘা'টা যে টার্গেটে লেগেছে, বিলিমোরিয়ার হকচকানো মুখটা দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে। তিনি যখন উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, অশোকই তাঁকে নাকানি-চোবানি থেকে বাঁচিয়ে দিল, 'ঠিক আছে, এই ব্যাপারটা বাদ দিন—'

ভট্টাচারিয়া ধূরন্ধর ব্যক্তি। বিলিমোরিয়া কাত হয়ে পড়ায় মেজর জেনারেলের কাল্পনিক উর্দিটা তিনিই গায়ে চড়িয়ে নিলেন, নীরস গলায় বললেন, 'বাদ যাবে কেন? আপনি কি সিওর বজবজে আমাদের স্পাই আছে?'

অশোক একটু জোর দিয়েই বলল, 'আছে কি নেই, আমি সিওর কি সিওর নই, ইট'স, ইনসিগনিফিকান্ট। কেন আমি বজবজে আমাদের ওয়ার্কারদের কোয়ার্টারগুলোতে গিয়েছিলাম তা জানতেই তো এই মিটিং ডাকা। সেটাই আসল পয়েন্ট। তাই না?'

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্লামডোয়েলার এই যুবকটি যে ইম্পোতের ফলার মতো ধারালো, আগে এতটা ভাবতে পারেননি ভট্টাচারিয়া। মনে মনে স্বীকার করতেই হল, অশোক তাঁকে কিছুটা কোণঠাসা করে ফেলেছে। রণকৌশলটা তিনি পাল্টে ফেললেন। অন্য কোনও ছোটখাট ব্যাপারে সময় নষ্ট না করে লড়াইটা বরং সোজাসুজি হোক। বললেন, 'কেন গিয়েছিলেন ব্যানার্জি সাহেব?'

অশোক সরাসরি ভট্টাচারিয়ার চোখের দিকে তাকাল, 'বজবজের ওই জায়গাটা কি আমার পক্ষে ফরবিডন এরিয়া—নিষিদ্ধ অঞ্চল?'

কয়েক পা যেন পিছু হটলেন ভট্টাচারিয়া, 'প্লিজ ডোন্ট মিস-আন্ডারস্ট্যান্ড আস। ওখানে যে কেউ যেতে পারে। কারও বাধা দেবার ক্ষমতা নেই।'

'তাহলে?'

'আমাদের হাউসের টপমোস্ট মানুষটি হঠাৎ কেন ওখানে চলে গেলেন তাই নিয়ে খুব কৌতূহল হচ্ছিল।'

'সিম্পল কিউরিয়াসিটি, তাই তো। তাছাড়া আর কিছু নয়?'

'আছে ব্যানার্জিসাহেব। অত দূরে যাওয়া, তারপর ফিরে আসা—আপনার খুব স্ট্রেন হবে, এই নিয়ে আমাদের টেনশনও হচ্ছিল। ইন ফ্যাক্ট অফিসে ফেরার পর আপনার শরীরও খারাপ হয়েছিল।'

'আপনারা আমার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে এত ভাবেন, সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ—' অশোক হাসিমুখে বলল, 'আর কিছু?'

ভট্টাচারিয়ার মুখচোখের চেহারা দ্রুত বদলে যেতে লাগল। নীরস, কঠিন গলায় বললেন, 'সেটাই তো আপনার কাছে জানতে চাই—'

দু'এক মুহূর্ত ভেবে নিল অশোক। শুধু ভট্টাচারিয়াই নন, টেবিলের তিন দিকের অন্য মুখগুলো দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে সবাই অত্র হাতে তুলে নিয়েছে। বলবে, 'আমার কাছে কী জানতে চান?'

বজবজারদের কোয়ার্টারগুলোতে গিয়ে আপনি কী দেখলেন, লেবারারদের কী বললেন, কী করলেন—এই সব?'

'আই সি। উত্তরটা আমি পরে দেব। তার আগে আমার কিছু প্রশ্ন আছে—'

হাই পাওয়ার কমিটির অন্য দুই মেম্বার মিস্টার সান্ধু এবং মিস্টার আগরওয়াল এতক্ষণ নীরবে বসেছিলেন। এবার সান্ধু মুখ খুললেন, 'বেশ তো।'

'আমার আগে এই হাউসের কোনও চেয়ারম্যান, এমডি, ডিরেক্টর বা টপ কোনও এগ্‌জিকিউটিভ কখনও ওখানে গেছেন?'

সান্ধু আকাশ-পাতাল হাতড়ে উত্তরটা খুঁজলেন। তারপর বললেন, 'নো আইডিয়া—'

অশোক অন্য মেম্বারদের দিকে তাকাল, 'আপনারা বলতে পারেন?'

সবাই ঘাড় ঝাঁকালেন—জানেন না।

একটু নৈঃশব্দ্য।

তারপর বিলিমোরিয়া বললেন, 'চেয়ারম্যান ডিরেক্টররা ওখানে যাবেন—ভাবা যায়! কী বলছেন ব্যানার্জিসাহেব! অ্যাবসোলিউটলি অ্যাবসার্ড।' তাঁর চোখেমুখে প্রবল বিরক্তি।

অশোকের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল, 'আমি কিন্তু এই হাউসের চেয়ারম্যান কাম এমডি।'

বিলিমোরিয়া অপ্রস্তুত, 'আপনি স্যর এক্সেপশন।'

'বাই চান্স আমি এই হাউসে এসে পড়েছি। বেসিক্যালি আমি একজন কমোনার। আমার রুটটা ফলকাতার এক বস্তিতে। তাই আমার পক্ষে যেতে অসুবিধে হয়নি। সে যাক, আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে।'

বিলিমোরিয়া একটু মিইয়ে গিয়েছিলেন। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বলুন, বলুন—'

'ওয়ার্কারদা আমাদের এই হাউসের বিরাট পার্ট তো?'

'অফ কোর্স। তাদের বাদ দিয়ে এত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পয়ার কি চলতে পারে? ইমপসিবল—'

'স্বীকার করছেন?'

'মোস্ট সার্টেনলি।'

অশোকের ঠোঁটে যে হাসিটা একটু আগে চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে, ফের সেটা ফিরে এল, 'ওয়ার্কাররা যদি ইমপর্টান্ট পার্টই হয়, তাঁরা কীভাবে, কোন অ্যাটমোসফিয়ারে বছরের পর বছর কাটিয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ কি আপনারা রাখেন?'

শুধু বিলিমোরিয়া নন, হাইপাওয়ার কমিটির অন্য মেম্বাররাও হতচকিত। সবচেয়ে করুণ হাল বিলিমোরিয়ার। প্রায় ধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ঝোঁকের মাথায় শ্রমিকদের সম্বন্ধে যা যা বলেছেন সেসব যে তাঁকে এতটা বিপাকে ফেলে দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল। আসলে বস্তির ওই অতি ধড়িবাজ ছেলেটার চতুর চালে তাঁদের মাত করে কথাগুলো বলিয়ে নিয়েছে।

ড্যামেজ কন্ট্রোলের দায়িত্বটা নিলেন সান্ধু, 'ব্যানার্জিসাহেব, লেবারারদের মাসের শেষে রেগুলারলি স্যালারি দেওয়া হয়। বছরে একবার বোনাস। তা ছাড়া ওভারটাইম।'

অশোক হাসল, 'সান্ধু সাহেব, আমি স্যালারি, ওভারটাইম, বোনাস-টোনাসের কথা জানতে চাইছি না। বলছেন আমাদের কয়েকটা ফ্যাক্টরির ওয়ার্কাররা কী অবস্থায় থাকে সেটাই বলতে চাইছি। আপনাদের কি সে সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া আছে?'

সান্ধুরা চুপ। তাঁদের মুখ-চোখ দেখে মনে হল অস্বস্তি বোধ করছেন।

অশোক বলতে লাগল, 'মান্ধাতার আমলের পুরনো ভাঙাচোরা টালির চালের লম্বা লম্বা ক'টা ব্যারাক টাইপের বাড়ি। সারি সারি খুপরির মতো সব ঘর। সেগুলোর সামনের দিকে টানা বারান্দা। দুটো করে খুপরি নিয়ে ওয়ার্কারদের একেকটা ফ্যামিলি থাকে। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছে। সিমেন্ট উঠে গিয়ে মেঝে এবড়ো-খেবড়ো। সামনের বারান্দার জং-ধরা টিন কি টুটো-ফুটো অ্যাসবেস্টস দিয়ে ঘিরে রান্নার ব্যবস্থা। আরও শুনবেন?'

কারও সাড়াশব্দ নেই।

অশোক থামেনি, 'দুটো ব্যারাকের মাঝখানে যাতায়াতের জন্যে দশ ফিটের মতো প্যাসেজ। সেগুলো মল, মূত্র, থকথকে কফ, পোড়া বিড়ি অজস্র টুকরো বোঝাই। তাছাড়া এধারে ওধারে আবর্জনা ডাই হয়ে আছে। প্যাসেজগুলো থেকে কী

ধরনের সুরভি উঠে আসছে, আশা করি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।'

বিলিমোরিয়া গলার ভেতর থেকে জড়ানো জড়ানো, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বের করলেন। কিছুই বোধগম্য হল না।

অশোক বলেই চলেছে, 'আপনাদের আরও কিছু জানাবার আছে। পলিউশনের লেভেল কোথায় পৌঁছতে পারে, ওখানে না গেলে বোঝা যাবে না। ওখানকার বাতাসে খুব সম্ভব পৃথিবীর সবরকম ভিজিব্লের ব্যাকটেরিয়া ভেসে বেড়াচ্ছে। ম্যালনিউট্রিশনে ভোগা ওখানকার হাড়-পাঁজরা বের করা চেহারা। খুব সরু হয়ে দিনে দু'বার মিউনিসিপ্যালিটির জল আসে। কয়েকটা টিউবওয়েলের ওপর কয়েক হাজার মানুষকে নির্ভর করে থাকতে হয়। ছেলে-মেয়েদের জন্যে স্কুল নেই, হেলথ সেন্টার নেই। হাসপাতাল এখান থেকে অনেক দূরে। হঠাৎ কারও মারাত্মক কোনও অসুখ-বিসুখ বা অ্যাকসিডেন্ট হলে হাসপাতাল পর্যন্ত কি তাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়? তার আগেই যেখানে পৌঁছবার পৌঁছে যায়।'

হাইপাওয়ার কমিটির মেম্বারদের দিকে অদৃশ্য একটা রাইফেল তাক করেই রেখেছে অশোক আর সমানে ট্রিগার টিপে চলেছে। পকেট থেকে ব্রাউন রঙের একটা খাম বের করল সে। ফোটোগ্রাফার বিকাশকে দিয়ে গোপনে বজবজের ওয়ার্কারদের কোয়ার্টারগুলোর যে ছবি তুলিয়ে আনা হয়েছিল তার একটা সেট রয়েছে খামটার ভেতর। ছবিগুলো বের করে টেবিলের ওপর পরপর সাজিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি যে ডেসক্রিপশন দিয়েছি, দেখুন তার সঙ্গে মেলে কি না।' একের পর এক দেখাতে দেখাতে একটা ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল সে, 'দিস ইজ ভেরি ভেরি স্পেশাল। এই যে দেখছেন বারান্দার একধারে কাপড় দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা রয়েছে, এটা হল মেটানির্টি হোম। হঠাৎ লেবার পেন ওঠায় মেয়েটাকে আর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এখানে মানুষের জন্ম মাঝে মাঝে এভাবেই হয়।'

সান্ধু জিগ্যেস করলেন, 'ব্যানার্জি সাহেব, আপনি কি ফোটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে বজবজে গিয়েছিলেন?'

অশোক চোখ সরু করে হাসল, 'সান্ধু সাহেব, আপনার মতো হাইলি-এডুকেটেড, ইনটেলিজেন্ট পার্সনের কাছে এরকম একটা প্রশ্ন আশা করিনি।'

'মানে?' একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন সান্ধু।

'আমি যে বজবজে ওয়ার্কারদের কোয়ার্টারগুলো দেখতে গিয়েছিলাম আপনাদের গুণ্ডচরেরা তা তো সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছিল। ফোটোগ্রাফারের কথা কি বলেছে?'

সান্ধু থতমত। উত্তর হাতড়াতে লাগলেন।

আগরওয়াল বললেন, 'ফোটোগ্রাফার নিয়ে যাননি, লেকিন এত্তে এত্তে পিকচার কালেক্ট করে ফেলেছেন! আপনি জরুর মেজিক জানেন—'

এসব অবান্তর কথার কোনও মানে হয় না। কয়েক লহমা আগরওয়ালকে দেখে বিলিমোরিয়ার দিকে তাকাল অশোক, 'একটা ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি, চেয়ারম্যান, এম ডি, অন্য সব ডিরেক্টরদের থাকার জন্যে হাউস সিটির সবচেয়ে পশ এরিয়ায় প্যালেসের মতো বিল্ডিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। টপ এগ্‌জিকিউটিভ, ম্যানেজার আর অফিসারদের জন্যে দেড় থেকে দু'হাজার স্কোয়ার ফিটের সব ফ্ল্যাট। এঁদের জন্যে প্রচুর কমফোর্টের বন্দোবস্ত। এঁরা নানারকম পার্কস তো পানই। সেই সঙ্গে মেডিক্যাল এক্সপেন্স, বছরে একবার ফ্যামিলি নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকায় বেড়িয়ে আসার সমস্ত খরচ হাউসই দিয়ে থাকে।'

বিলিমোরিয়া বললেন, 'ব্যানার্জি সাহেব, এঁদের কনট্রিবিউশনটার কথা ভেবে দেখুন। এঁরা ছাড়া আমাদের হাউস কি এত বড় একটা এম্পায়ার হয়ে উঠতে পারত?'

'একটু আগে হাইপাওয়ার কমিটির কে একজন মেম্বার যেন

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের
অন্যতম প্রাচীন অগ্রণী সমবায় ব্যাঙ্ক
শারদ শুভেচ্ছা
দি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস : ৬৪ নং, জি. টি. রোড, পোঃ- বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১
ওয়েব সাইট : www.burdwanccb.in
টেলিফোন নং: ২৫৬০৩৫৫, ২৬৬৩১৬১, ২৬৬২১৭৫, ২৬৬৩১৬২, ২৬৬৩১৩২, ২৬৬২১৬৯
ফ্যাক্স : (০৩৪২)-২৬৬২১৬৩
৩৮টি শাখার মাধ্যমে জেলা ব্যাপী কৃষি, শিল্প ও সহায়ক কর্মকাণ্ডের দ্বারা জনগণের সেবায় সদা নিয়োজিত।
-ঃ আমাদের বিশেষ পরিষেবা ঃ-
❖ সেভিংস ব্যাঙ্ক আমানতে অধিক সুদ। ❖ ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, কিষাণ বিকাশ পত্র ও জীবন বীমার পলিসি বন্ধকী ঋণ। ❖ সহজ শর্তে ও কম সুদে : (১) ব্যক্তিগত ঋণ, (২) যানবাহন ক্রয়বাবদ ঋণ, (৩) গৃহ নির্মাণ ঋণ, (৪) মর্টগেজ (বন্ধকী) ঋণ ও (৫) শিক্ষা ঋণ। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পভিত্তিক মেয়াদী ঋণ। ❖ কৃষি সমবায় কপালন সমিতির মাধ্যমে শস্যঋণ, তন্তুবায় সমিতিকে ঋণ, ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ। ❖ সমস্ত শাখার মাধ্যমে কোর ব্যাঙ্কিং, RTGS/NEFT, e-Commerce, POS Transaction, ATM পরিষেবা। ❖ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে Micro-ATM-এর সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। ❖ PMJJBY, PMSBY, APY-এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা। ❖ কিসান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যত লক্ষ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বীমার সুবিধা। ❖ ঋণগ্রহীতার জীবন-এ DICGC-র মাধ্যমে বীমা দ্বারা সুরক্ষিত।

বললেন, ওয়ার্কারদা আমাদের হাউসের অ্যাসেটে। আমার ছোট একটা প্রশ্ন, যারা গায়ের রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বছরের পর বছর আমাদের কারখানাগুলোতে প্রোডাক্ট বানাচ্ছে আর সেই সব প্রোডাক্ট দেশের মার্কেটে বেচে আর বিদেশে এক্সপোর্ট করে এই হাউস কোটি কোটি টাকা প্রফিট করেছে তারা কি একটু বেটার ট্রিটমেন্ট আশা করতে পারে না?'

'মানে?'

'মানেটা হল এই মানুষগুলোর কি কোনও কনট্রিবিউশন নেই?'

সাঙ্কুর মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে এল, 'ব্যানার্জি সাহেব, আপনি কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মতো কথা বলছেন। নট অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট—'

মস্তিষ্ক তপ্ত হয়ে উঠল অশোকের, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

সাঙ্কু মুহূর্তে বুঝে ফেলেছেন, বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তক্ষুনি শুধরে নিলেন, 'সরি স্যর, এভাবে বলটা আমার ঠিক হয়নি।'

উত্তাপটা জুড়োতে কিছুটা সময় লাগল। তারপর অশোক খুব ঠান্ডা গলায় বলল, 'সাঙ্কু সাহেব, আমি রাজনীতি করতে এখানে আসিনি। রাজনীতি আমি করিও না। আপনি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা মনে হয় খুব ভালো জানেন না। ভাঙাচোরা ব্যারাকের মতো বাড়িতে সুড়ঙ্গের মতো ঘরে, মোস্ট অনহাইজিনিক পরিবেশে আমাদের শ্রমিকরা থাকে, এই সরল সত্যটা শুধু আপনাদের জানাতে চেয়েছি—'

ভট্টাচারিয়া বললেন, 'ব্যানার্জি সাহেব, আপনি খুব বেশিদিন আমাদের হাউসে আসেননি, মাত্র সাড়ে তিন মাস। তাই হয়তো জানেন না, কারা এর জন্যে দায়ী—'

অশোক অবাক। দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকায়, 'কারা?'

'ইন্ডিপেনডেন্সের পর যে ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছ থেকে আমরা বজবজের ফ্যাক্টরিগুলো কিনেছিলাম তারাই ওয়ার্কারদের জন্যে ওই ব্যারাকগুলো বানিয়েছিল—'

'কত বছর আগে ওই সব ফ্যাক্টরি আর ব্যারাকগুলো তৈরি হয়েছিল, জানেন?'

কিছুক্ষণ ভেবে ভট্টাচারিয়া বললেন, 'এগ্‌জাক্ট সাল বা তারিখ বলতে পারব না। তবে রাফলি গেস করতে পারি, নাইনটিথ সেঞ্চুরির শেষ দিকে বা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শুরুতে—'

'তার মানে ষাট-সত্তর বছর আগে।'

'তাই হবে—'

'তার মানে তিন জেনারেশনের মতো লেবাররা ওই ব্যারাকগুলোতে থাকছে।'

অশোক কথার মারপ্যাঁচে তাঁকে কোন দিকে নিয়ে চলেছেন, তা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছেন সাঙ্কু। তিনি উত্তর দিলেন না।

আগরওয়াল অনেকক্ষণ ধরেই কিছু বলার জন্য উশখুশ করছিলেন। সাঙ্কুকে চুপ করে থাকতে দেখে সুযোগটা পেয়ে গেলেন, 'ব্যানার্জি সাহেব, আমরা ইন্ডিয়ানরা সব ঈশ্বর বিশ্বাসী, এটা তো মানবেন—'

আগরওয়ালের কপালে চন্দনের তিনটে লাইন, কানের লতিতেও চন্দনের টিপ। তিনি যে ঘোর ঈশ্বরভক্ত তা এই হাউসে আসার পরই জেনে গেছে অশোক। কিন্তু হাই-পাওয়ার কমিটির মিটিংয়ে আচমকা কেন লোকটা ঈশ্বরকে টানাটানি করছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অন্য মেম্বারদের মতো আগরওয়ালও যে যথেষ্ট ধূরন্ধর, সেটা ভালোই জানে অশোক। সতর্কভাবে বলল, 'মানছি ভারতবাসীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে—'

আগরওয়ালের অনেকটা চৌকো ধরনের চওড়া মুখমণ্ডল জুড়ে আরও চওড়া হাসি ফুটে উঠল, 'মানতেই হবে। আপনি জঙ্গর আরও মানবেন, সব কৃষ্ণ ভগোয়ানের ইচ্ছা—'

'তাও মানলাম। কিন্তু আজকের এই মিটিংয়ের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক সেটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন—'

সরাসরি উত্তরটা না দিয়ে আগরওয়াল জিগ্যেস করলেন, 'আপনি অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন?'

প্রথমে ছিল বিস্ময়, এখন তার সঙ্গে অদৃষ্টও জুটে গেল। অশোক বিরক্ত হচ্ছিল, সেই সঙ্গে মজাও যে লাগছিল না তা না। বলল, 'অদৃষ্ট ব্যাপারটা আমার হিসেবের বাইরে। এ নিয়ে আগে কখনও ভাবার সময় পাইনি।'

আগরওয়ালের ঘাড়ে আজ কী চেপেছে, কে জানে। বললেন, 'ললাটলিপি কাকে বলে জানেন?'

অশোক বলল, 'শুনেছি কিন্তু ঠিক জানি না—'

'ও হো হো, ভারতবাসী হয়ে জানেন না? এটা ঠিক হচ্ছে না ব্যানার্জি সাহেব—' আগরওয়ালের গলায় আক্ষেপের সুর।

এতক্ষণ হালকা চালের মজটজা মনে করে আগরওয়ালকে অশোক প্রশ্রয়ই দিয়েছিল। কিন্তু যেভাবে লোকটা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, এবার তাকে থামানো দরকার। গম্ভীর গলায় বলল, 'একটা সিরিয়াস ব্যাপারে ডিসকাশনের জন্যে এই মিটিংটা ডাকা হয়েছে। আমরা কিন্তু আসল টপিক থেকে অন্য দিকে চলে যাচ্ছি—'

'নো নো ব্যানার্জি সাহেব—' আগরওয়াল ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'চিন্তা করবেন না দিশা আমাদের ঠিক আছে। আসল ডেস্টিনেশনে আমরা পৌঁছে যাব। ফ্রিফ আর টু মিনিটস—'

দু'মিনিট সময় দেওয়া যেতেই পারে। অশোক অপেক্ষা করতে লাগল।

আগরওয়াল নতুন এনার্জি নিয়ে শুরু করলেন, 'ললাটলিপির কথা হচ্ছিল তো?'

দৌড়টা দেখাই যাক। অশোক আস্তে আস্তে ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ—'

'সব ভারতবাসী জানে, মানুষ তার মাতাজির গর্ভ থেকে দুনিয়ায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ভগোয়ান তার কপালে ভূত-ভবিষ্যৎ সব লিখে দেন। এই হল ললাট লিপি। তা কখনও খণ্ডানো যায় না।'

এতক্ষণে কুয়াশা কেটে রোদের একটা ঝিলিক দেখা দিল। আগরওয়ালের এত ধানাই-পানাইয়ের কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে। অশোক বলল, 'ওয়ার্কাররা নারকুণ্ডের মতো জায়গায় জেনারেশনের পর জেনারেশন কাটিয়ে দিক, স্বয়ং ভগবান এটাই ওদের কপালে লিখে দিয়েছেন, আর সেটাই বোধহয় আপনি বলতে চেয়েছেন আগরওয়াল সাহেব—'

আগরওয়ালের জবাব মিলল না। তিনি ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বসে রইলেন। তাঁর বাইফোকাল চশমার ওধারে দুই চোখে এক চিলতে ধূর্ত হাসি দেখা দিয়েই চকিতে উধাও হল।

ভগবান, ঈশ্বর, ললাটলিখন, এত সব টেনে এনে চালিয়ে যাচ্ছিলেন আগরওয়াল। হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। এবার স্ট্রিয়ারিংটা ধরলেন ভট্টাচারিয়া, 'আপনি কিছুক্ষণ আগেই শুনেছেন, ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ওয়ার্কারদের জন্য ওই ব্যারাকগুলো বানিয়েছিল, আমরা নই—'

'এটা কোনও এক্সকিউজ হল?'

'মানে?'

'স্বাধীনতার আগে ইন্ডিয়া ছিল ব্রিটিশ কলোনি। ইংরেজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের একমাত্র মন্ত্র ছিল এক্সপ্লয়েটেশন। শ্রমিকদের প্রচণ্ড খাটিয়ে, যতটা সম্ভব কম পয়সা দিয়ে, অন্ধকূপ টাইপের মোস্ট অনহাইজিনিক, মোস্ট পলিউটেটেড আস্তানায় তাদের গাদাগাদি করে ঢুকিয়ে দিয়ে কোটি কোটি টাকা লুট করে নিয়ে গেছে।'

ভট্টাচারিয়ার গলার ভেতর থেকে জড়ানো জড়ানো কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এল। তার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

অশোক বলতে লাগল, 'তেরো-চোদ্দো বছর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। ফর্টিসেভেনের ঠিক পরে পরেই মালিকানা বদল হয়ে বজবজের ফ্যাক্টরিগুলো আপনাদের হাতে চলে এসেছে। কলোনিয়াল প্রভুদের হাত থেকে ট্রাল্ফার অফ পাওয়ারটা যে

হল তার তো একটা সুফল পাওয়া যাবে। সোসাইটির সব স্তরের মানুষ আগের থেকে অনেক ভালো থাকবে, নইলে কীসের স্বাধীনতা!'

তো তো করে ভট্টাচারিয়া বললেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই—'

'তাই যদি হবে, আমাদের বজবজের ফ্যাক্টরিগুলোর ওয়ার্কারদের হাল ওইরকম কেন? আপনারা তো দেখছি ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের লিগ্যাসি বয়ে বেড়াচ্ছেন—'

কনফারেন্স হল-এর এই দিকটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

অশোক সোজাসুজি আগরওয়ালের দিকে তাকায়, 'আগরওয়াল সাহেব, আপনি ভগোয়ান, ঈশ্বর, এঁদের কথা বলছিলেন না? সেই রোলটা আপনি, মিস্টার বিলিমোরিয়া, মিস্টার ভট্টাচারিয়া, মিস্টার সান্ধুকে নিতে হবে।'

হাই পাওয়ার কমিটির চারজন মেম্বারের মুখ-চোখের চেহারা লহমায় পাল্টে গেল। তাঁদের হতবুদ্ধির মতো দেখাচ্ছে। আগরওয়াল শুধু বললেন, 'মতলব?'

'আপনি ললাটলিখন, অদৃষ্টের কথা বলছিলেন না? মালিকরা তো ওয়ার্কারদের কাছে ভগবান। ইংরেজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা আমাদের শ্রমিকদের কপালে যা লিখে দিয়ে গিয়েছিল দেশটা স্বাধীন হবার পর সেসব ঘষে ঘষে তুলে দিয়ে ওদের অদৃষ্টটা পুরোপুরি বদলে দেওয়া উচিত ছিল—'

'কী বলতে চাইছেন ব্যানার্জি সাহেব?'

'যে নরককুণ্ডে আমাদের ওয়ার্কাররা তিন-চার জেনারেশন ধরে থাকছে সে সব ভেঙে প্রত্যেকটা ফ্যামিলির জন্যে দু'কামরার আলাদা আলাদা বাড়ি তৈরি করে দিতে হবে। রাস্তাগুলো হবে নিট অ্যান্ড ক্লিন। রোজ সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে সুইপার থাকবে। ওখানে জলের সাপ্লাই খুব খারাপ। সাফিসিয়েন্ট জল, শৌচালয়, ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল, খেলার মাঠ, পার্ক, হেলথ সেন্টার— আমাদের হাউসের তরফ থেকে সমস্ত কিছু করে দিতে হবে।'

অন্য তিন মেম্বার এবার হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

হাত তুলে তাঁদের থামিয়ে দিল অশোক, 'আমাকে শেষ করতে দিন। তারপর আপনাদের কথা শুনব। ফর্টি সেভেনের পর আপনারা শ্যামপুরে আর হুগলি ডিস্ট্রিক্টে ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছ থেকে আরও কয়েকটা জুট মিল, রেলের চাকা আর ওয়াগন তৈরির কারখানা কিনে নিয়েছেন। ঠিক কি না?'

বিলিমোরিয়ারা চমকে উঠলেন। কেউ মুখ থেকে একটি শব্দ বের করলেন না।

অশোক বলল, 'আপনারা যখন জবাব দিচ্ছেন না, ধরেই নিচ্ছি আমি ঠিকই বলেছি—' সে বলতে লাগল, 'আপনাদের চমক দেবার জন্যে আরও কিছু বলা যাক। এইসব ফ্যাক্টরিতে অ্যারউইন টোয়েন্টি টু, টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ওয়ার্কার কাজ করে।'

নিজের অজান্তেই যেন সান্ধু বলে ফেললেন, 'ব্যানার্জি সাহেব, আপনি মাত্র তিন মাস কেরিয়ার দিন এই হাউসে এসেছেন। এসব ইনফরমেশন এত অল্প সময়ে কীভাবে পেলেন?'

'এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের মাথায় কী একেবারে আকাট আনাড়ির মতো এসে বসেছি? চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হব অথচ হাউস সম্পর্কে কিছুই জানব না তা কখনও হতে পারে? এই হাউসে ঢোকার আগে খানিকটা হলেও প্রস্তুত হতে হয়েছে। এখানে আসার পর আরও অজস্র ইনফরমেশন জোগাড় করতে হয়েছে। কীভাবে কালেক্ট করেছি জানতে চাইবেন না। ওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব না।'

ভট্টাচারিয়া জিগ্যেস করলেন, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই—'

'বজবজের কথা হচ্ছিল। শ্যামপুর আর হুগলির ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলোর প্রসঙ্গ আসছে কেন?'

'একই কারণে। ওগুলোও ইংরেজ শিল্পপতিদের কাছ থেকে আপনারা কিনেছেন। ওইসব ইউনিটগুলোর ওয়ার্কারদের জন্যেও ব্রিটিশ মালিকরা যে শুয়োরের খোঁয়াড় বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এই জেনারেশনের শ্রমিকরা বজবজের ওয়ার্কারদের মতোই অসহ্য কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।'

'আপনি কি ওই দুটো জায়গাতেও গিয়েছিলেন?'

'না। তবে যাওয়ার ইচ্ছে আছে—' অশোক বলল, 'বজবজের ওয়ার্কারদের জন্যে যা যা করার কথা বলেছি, শ্যামপুর আর হুগলির শ্রমিকদের জন্যে অবিকল তেমন তেমনই করে দিতে হবে।'

চমকটা কেটে গিয়েছিল। সান্ধু গম্ভীর গলায় বললেন, 'দিস ইজ অ্যাবসোলিউটলি ইমপসিবল ব্যানার্জি সাহেব—'

'কারণ?'

'আপনি নিশ্চয় জানেন, হাই পাওয়ার কমিটি ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে এই হাউসের সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কমিটির সব মেম্বার বা বেশির ভাগ মেম্বার একমত হলেই তবে কোনও কিছু করা সম্ভব। আপনি যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন তাতে আমি রাজি নই। অন্য মেম্বারদের মতামত এবার নেওয়া যাক—'

বিলিমোরিয়া, আগরওয়াল এবং ভট্টাচারিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তাঁরাও রাজি নন। কারণটাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন, বজবজ, শ্যামপুর আর হুগলিতে ব্যানার্জি সাহেবের প্রস্তাবমাফিক কাজটা করতে গেলে ওয়ার্কারদের জন্য তিনটে গ্ল্যানড শহর বানাতে হবে। তার জন্য খরচ মিনিমাম আশি-নব্বই কোটি টাকা। হাই পাওয়ার কমিটি এই বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের বিপক্ষে।

এক এক করে ধীরে-সুস্থে খুব ঠান্ডা চোখে চার কমিটি মেম্বারকে দেখে নিল অশোক। তারপর বলল, 'মিস্টার বিলিমোরিয়া, মিস্টার সান্ধু, মিস্টার আগরওয়াল, মিস্টার ভট্টাচারিয়া, আমি খবর নিয়েছি ওয়ার্কারদের জন্যে আমি যা

আশীষ বসু
সমাজসেবী ও প্রাক্তন কাউন্সিলর ২৮ নং ওয়ার্ড
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শুভ শারদীয়া,
দীপাবলী ও ছট্‌পূজার হার্দিক অভিনন্দন।

চেয়েছি সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার এক্তিয়ার হাই পাওয়ার কমিটির নেই। হাউসের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেই ডিসিশন নিতে পারেন। তা ছাড়া তাঁর আরও একটা স্পেশাল ক্ষমতা আছে। তিনি ইচ্ছে করলে পঞ্চাশজন বেকার ছেলের চাকরি দিতে পারেন।'

চার মেম্বারের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল।

অশোক থামেনি, 'আপনাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে নতুন নতুন প্রোজেক্টের প্ল্যান করা, সেগুলো কোথায় কোথায় সেট-আপ করা হবে সে জন্য ল্যান্ড কেনা, ফ্যাক্টরিগুলো থেকে যে প্রোডাক্ট বেরয় তার মার্কেটিং আর এক্সপোর্টের দিকগুলো দেখা, ইন্ডাস্ট্রির জন্য ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া, শেয়ার ছেড়ে টাকা তোলা, এমপ্লয়িরা কে কী ধরনের কাজ করে সেই অনুযায়ী আলাদা আলাদা পে-স্কেল কি করে দেওয়া—এ সবের বাইরে আর কিছু নেই। আমি বোধ হয় ভুল বলছি না।'

কেউ উত্তর দিলেন না।

অশোক বলতে লাগল, 'আমি যে প্রস্তাবটা দিয়েছি সেটা কিন্তু আমার এক্তিয়ারের বাইরে নয়। হাউসের টপমোস্ট পার্সন হিসেবে কর্মীদের ভালোভাবে বেঁচে থাকা, তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকগুলো আমি দেখতে পারি এবং সেটা হাউসের স্বার্থে। তারা সুস্থ থাকলে, সুন্দর পরিবেশে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলে ডিউটিটা মন দিয়ে করবে। আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো থেকে যে সব প্রোডাক্ট বেরবে তার কোয়ালিটি অনেক বেড়ে যাবে, সেই সঙ্গে মার্কেটে সেগুলোর ডিমান্ডও। বেনিফিটটা কার হবে? আমাদের হাউসেরই তো। সে যাক, আমাকে আনরিজনেবল ভাববেন না—'

মেম্বাররা ধন্দে পড়ে গেলেন। শ্রমিকদের সম্বন্ধে পরম করুণাময়ের মতো বলতে বলতে কথার মোড়টা হঠাৎ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল কেন অশোক, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সবাই উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে রইলেন।

অশোক বলল, 'হঠাৎ আশি-নব্বই কোটি টাকা বের করে দিলে আমাদের হাউসের ওপর প্রেশার পড়ে যাবে। একটা একটা করে টাউন তৈরি করে পাঁচ কি ছ'বছরে পুরো প্রোজেক্টটা কমপ্লিট করার প্ল্যান করা হবে। তাতে চাপ থাকবে না।'

মন্দের ভালো। অনিচ্ছা থাকলেও সবাই মেনে নিলেন। মানতে বাধ্য হলেন। এই হাউসে কার কতটা ক্ষমতা, এই উড়ে এসে জুড়ে বসা ছোকরাটা খুব সম্ভব জেনে গেছে। তাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়।

সহযোগিতার জন্য মেম্বারদের ধন্যবাদ জানিয়ে অশোক বলল, 'এই হাউসে আসার পর আমি ভেরি ভেরি ইমপর্টেন্ট আরও কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি। বলতে পারেন, হঠাৎ-ই আমার হাতে এসে গেছে।'

কমিটি মেম্বাররা নড়েচড়ে বসলেন। তাঁদের চোখে-মুখে কৌতূহলের চেয়ে যা বেশি করে ফুটে উঠল তা উৎকণ্ঠা। এই যুবকটিকে তাঁরা আদৌ বিশ্বাস করেন না। হয়তো এমন কিছু সে পেয়েছে যা জানাজানি হলে বা কাজে লাগালে এই হাউসের ভিত টলে যাবে। সোমদেব চ্যাটার্জির মাথায় কী খেয়াল যে চেপেছিল, এরকম একটা বস্তির ছেলেকে কিনা এত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের চূড়ায় এনে বসিয়ে দিয়েছেন। জিগ্যেস করলে বলেন, অশোক ব্যানার্জিকে নাকি একটা এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ দিয়েছেন। কীসের এক্সপেরিমেন্ট? এত বড় একটা হাউসকে ধ্বংস করে দেবার?

বিলিমোরিয়া বেশ সতর্কভাবে জানতে চাইলেন, 'কী ইনফরমেশন ব্যানার্জি সাহেব?'

অশোক বলল, 'আজ নয়। কিছুদিন ওয়েট করুন। আমিই একটা মিটিং ডেকে আপনাদের জানিয়ে দেব। তার আগে ওয়ার্কারদের জন্যে নতুন কোয়ার্টার তৈরির কাজ শুরু হোক।'

শুধু বিলিমোরিয়া নন, অন্য তিন কমিটি মেম্বারও মাথা নাড়লেন— শুরু হবে।

অশোক জিগ্যেস করল, 'আপনাদের আর কি কোনও বক্তব্য আছে?'

'না ব্যানার্জি সাহেব। আজকের মতো মিটিং শেষ।'

'দুটোয় আমার একটা প্রেস মিট আছে।' ঘড়ি দেখে অশোক বলল, 'এখন একটা বেজে বাহান্ন। এবার আমাকে যেতে হবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।' সে উঠে পড়ল।

॥ তেরো ॥

কনফারেন্স হল-এর পাশেই ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছিলেন চন্দ্রকান্ত রাহেজা। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দুটো ফ্লোর নীচে চলে এল অশোক। এখানে একটা হল-এর আধাআধি জুড়ে প্রেস কর্নার।

বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি এমনি নানা ভাষার পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছিলেন। শুধু এই মহানগরেরই নয়, দেশের অন্য সব বড় বড় শহরের দৈনিক পত্রিকার যে স্পেশাল করেসপনডেন্টরা এখানে আছেন, তাঁরাও এসেছেন।

প্রেস কর্নারের এক ধারে উঁচু প্ল্যাটফর্মে এই হাউসের চেয়ারম্যান বা ডিরেক্টরদের জন্য চেয়ার, টেবিল, মাইক। প্ল্যাটফর্মটার সামনের দিকে যাতায়াতের জন্য প্যাসেজ। তারপর সাংবাদিকদের জন্য সারি সারি চেয়ার।

অশোক প্রেস কর্নারে ঢুকতেই সাংবাদিকরা উঠে দাঁড়ালেন। অশোক হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার। প্লিজ আপনারা বসুন—'

সবাই বসলে অশোক হাসিমুখে বলল, 'আপনারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমি হাজির। বলুন কীভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি।'

এই হাউসে আসার পর থেকে বেশ কয়েকবার প্রেস কনফারেন্স করেছে অশোক। সাংবাদিকদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। প্রেসের লোকেরা জেনে গেছেন এই যুবকটি ট্র্যাডিশনাল গুরুগম্ভীর শিল্পপতি নয়। একেবারে অন্যরকম। হাসিখুশি, আমুদে। কথায় কথায় তার মজা। তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাংবাদিকরা জেনে গেছেন।

একটা ইংলিশ ডেইলির রিপোর্টার রাধিকা সামতানি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের দেশ ছিল অখণ্ড ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে, দেশ ভাগের পর সেটা হয়ে যায় পাকিস্তানের একটা প্রভিন্স। পাকিস্তানে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁর ঠাকুরদা পুরো ফ্যামিলি নিয়ে চিরকালের মতো কলকাতায় চলে আসেন। রাধিকার জন্ম, লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি এই শহরেই। এককম বাঙালিই হয়ে গেছেন। ঝরঝরে বাংলায় বললেন, 'স্যর, আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক জবাব চাই। ডিপ্লোম্যাটদের মতো এড়িয়ে গেলে চলবে না।'

'আমি ডিপ্লোম্যাট নই। এর আগেও বেশ কয়েকবার আমরা মিট করেছি। কখনও প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যেতে দেখেছেন?'

আস্তে মাথা নাড়ালেন রাধিকা, 'না স্যর, এড়ানোর কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে। সরি—'

'ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করছি না। প্রশ্নটা করুন—'

'দু'দিন আগে বজবজে আপনাদের ওয়ার্কারদের ব্যারাক টাইপের কোয়ার্টারগুলো দেখতে গিয়েছিলেন। খবরটা শোনার পর বিশ্বাসই হয়নি যে আপনার মতো ইন্ডিয়ার টপমোস্ট একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওখানে যেতে পারেন। ইন ফ্যাক্ট, স্বাধীন ভারতে আগে আর কখনও এত বিরাট মাপের শিল্পপতি শ্রমিকদের বস্তিতে গেছেন কি না আমাদের জানা নেই। এর একটা দুর্দান্ত নিউজভ্যালু আছে। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একদল রিপোর্টার বজবজে চলে গিয়েছিলাম।'

'আমি যে গিয়েছিলাম বিশ্বাস হয়েছে তো?'

প্রেস কর্নারের চারপাশ থেকে কলরোল উঠল, 'নিশ্চয়ই স্যর, নিশ্চয়ই—'

হিন্দি দৈনিক মাতৃভূমির রিপোর্টার বিনোদ সহায় জিগ্যেস করলেন, 'ব্যারাকগুলো দেখে আপনার কীরকম মনে হয়েছে?'

অশোক হাসল, 'আপনাদের যেমন মনে হয়েছে, আমারও ঠিক তাই—'

'আমাদের তো মনে হয়েছে আস্ত একটা হেল— নরক।'

অশোক নিঃশব্দে হাসল, উত্তর দিল না।

অন্য একটি ইংলিশ চ্যানেল 'এভরিডে'র বিনায়ক সোম বললেন, 'আমরা ওখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর মনে করেন।'

একটা উর্দু দৈনিকের সাংবাদিক লায়েক আলি বলল, 'আমরা মিনিমাম ষাট-সত্তর জন নানা বয়সের লোকের সঙ্গে শুধু কথাই বলিনি, ওখানকার প্রচুর ছবিও তুলেছি—'

তাকে শেষ করতে না দিয়ে একটা বাংলা কাগজের রিপোর্টার শোভন মল্লিক বলে উঠলেন, 'নিউজটা আমরা আগেই ছবিশুদ্ধ ছাপাতে পারতাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা না বলে, আপনার মতামত না জেনে প্রকাশ করিনি। মাঝখানে দু'দিন অসুস্থ হয়ে বাড়িতে রেস্ট নিইলাম। তাই ওয়েট করছিলাম।'

অশোক জিগ্যেস করল, 'আপনারা এগ্‌জ্যাক্টলি আমার কাছে কী জানতে চাইছেন?'

'দৈনিক দেশের খবর'-এর সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট অমিতেশ মালাকার বললেন, 'শ্রমিকদের আশা, অকারণে আপনি ওই ব্যারাকগুলো ভিজিট করতে যাননি, যে পরিবেশে তারা থাকে সেটা আর তেমন থাকবে না। আপনি তাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। অনেক এক্সপেক্টেশন ওদের—'

আরেকজন সাংবাদিক বললেন, 'আপনি যখন এই হাউসে প্রথম এলেন, একটা প্রেস কনফারেন্সে কী বলেছিলেন, মনে আছে?'

অশোক একটু চিন্তা করে বলল, 'অনেক কথাই তো বলেছি। আপনি ঠিক কোনটার ব্যাপারে জানতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনি বলেছিলেন এই হাউসে আপনি একটা মিশন নিয়ে এসেছেন। দেশের সোশ্যাল প্যাটার্ন পাল্টে দেবেন, বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করবেন— এই সব।'

'দেখুন, এই দেশে কোটি কোটি মানুষ। লক্ষ লক্ষ বেকার। একটা মাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস, তা যত বড়ই হোক, এই বিশাল দেশের সব সমস্যা ঘুচিয়ে দিতে পারে? আমি চাই আমাদের শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য, নিট অ্যান্ড ক্লিন পরিবেশে বাসস্থান, তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা— স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ভদ্র রকমের যাতে হয় তার ব্যবস্থা করা। এই তো সবে দেশ স্বাধীন হল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট সেভাবে হয়নি। নতুন নতুন কলকারখানা বসিয়ে যতজন সম্ভব বেকারকে চাকরি-বাকরি দিতে চেষ্টা করব। আমাদের দেখাদেখি অন্য হাউসগুলো যদি এগিয়ে আসে একটা বড় কাজ হয়।'

'যা বললেন সেই কাজে কি হাত দিয়েছেন?'

'আপাতত ঠিক হয়েছে, আমাদের শ্রমিকদের জন্যে ব্রিটিশ আমলের যে সব ব্যারাক টাইপের পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িগুলো রয়েছে সেগুলো ভেঙে নতুন টাউন বানানো হবে। কাজটা খুব তাড়াতাড়িই শুরু করতে যাচ্ছি। নতুন কলকারখানা, বেকারদের চাকরি-টাকরির প্ল্যান পরে করা হবে। তা ছাড়া আরও কিছু কিছু পরিকল্পনা আছে। সে সব আপনারা পরে জানতে পারবেন।'

'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের কমপ্লিট উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর জন্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসগুলোর বিরাট একটা রোল আছে। আপনাদের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকব।'

'ধন্যবাদ। আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

একজন সাংবাদিক জিগ্যেস করল, 'স্যর, একটা কথা জানতে চাই—'

শারদ শুভেচ্ছায়

আসানসোল পৌরনিগম
আসানসোল

দূষণমুক্ত আসানসোল , সবুজ আসানসোল

দূষণমুক্ত আসানসোল গড়তে শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় , মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী , পঃ বঙ্গ সরকারের অনুপ্রেরণায় যে কর্মকান্ড চলছে তার ভিত্তিতে আমাদের আবেদন :-

সাথী ,

পরিবেশ দূষণ এক ভয়ঙ্কর সংকট । দূষণের সাথে বদলে যাচ্ছে জলবায়ু , ফলে আমাদের এই গ্রহ দিন দিন আরো উষ্ণ হয়ে মারাণ রোগের আক্রমণ বাড়ছে ।

প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের বিপদ ঝয়ে আনে তাই আমাদের প্রিয় শহরকে পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচাতে আসানসোল পৌরনিগমের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে -

১. কোনো দোকানদার , হোলসেলার , খুচরো বিক্রেতা , হকার প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বিক্রয় বা মজুত করবেন না , যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ।
২. কোন প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বা শীট যদি ৫০ মাইক্রনের কম হয় তা ব্যবহার যোগ্য নয় ।
৩. প্রকাশ্য স্থানে পান মশলা , গুটকা ও ধূমপান নিষিদ্ধ ।

আসানসোলের সমস্ত সচেতন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন --

- আমাদের প্রিয় শহরকে দূষণ থেকে রক্ষা করতে প্রচুর গাছ লাগান ।
- নিজের এলাকা পরিষ্কার রাখুন । পৌরনিগম আপনার পাশে আছে ।
- প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারে বিরত থাকুন ।
- পুকুর নদী ও নালায় বর্জ্য না ফেলে তা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলুন ।
- বায়ু ও শব্দ দূষণ প্রতিরোধে সরকারী নির্দেশ অনুসরণ করুন ।

নমস্কারান্তে
শ্রী জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারী
মেয়র
আসানসোল পৌরনিগম

অশোক বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই—'

'আপনি কি সাম্যবাদী?'

'না।'

'সোশ্যালিস্ট?'

'না। রাজনীতি নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাইনি। আমাকে হিউম্যানিস্ট বলতে পারেন। চারটে বেজে গেছে। প্রেস মিটের সময় শেষ। আশা করি আপনাদের সবার সব কৌতূহল মেটাতে পেরেছি। ধন্যবাদ!' বলতে বলতে উঠে পড়ল অশোক।

হাই পাওয়ার কমিটির মিটিং আর প্রেস কনফারেন্সে অবিরল কথা বলতে হয়েছে। বিশেষ করে প্রশ্ন মিটিংটায় শুধুমাত্র কথাই নয়, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তুমুল। চারজন ঝানু কমিটি মেম্বার যেভাবে একের পর এক যুক্তি খাড়া করছিলেন তার বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তির সাজতে ঘাম ছুটে যাচ্ছিল অশোকের। এঁরা সব চতুর খেলোয়াড়। তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

পরপর দুটো মিটিংয়ের পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। প্রেস কনারের একধারে রাহেজা বসেছিলেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের চেম্বারে চলে এল অশোক। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল।

অন্য দিন অশোক চলে যায় কোনও ক্লাবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ন'টা সাড়ে ন'টা। এই হাউসে আসার পর সেটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। দৈনন্দিন কর্মসূচির একটা অংশ।

আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। সোজা ওল্ড বালিগঞ্জে চলে এল তারা। গাড়ি থেকে নেমে রাহেজাকে একতলায় তাঁর ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে লিফটে তেতলায় উঠে এল অশোক।

রোজ দু'বেলা দুপুরে আর সন্ধ্যায় ঠান্ডা জলে স্নান করত অশোক। এই হাউসে আসার পর অভ্যাসটা পাল্টে গেছে তার। এখন সকালে আর রাত্তিরে ঠান্ডা জল আর গরম জল মিশিয়ে দু'বার স্নান না করলে রাতের ঘুমটা ঠিকমতো হয় না।

আজ অনেক তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। সবে সন্ধে। কিন্তু এর মধ্যেই রাস্তায় রাস্তায় আর চারিদিকের উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলোতে অজস্র আলো জ্বলে উঠেছে। আলোয় ভেসে যাচ্ছে শহর।

অশোক বেশি রাতের জন্য অপেক্ষা করল না। স্নানটান সেরে পোশাক পাল্টে বাইরের ব্যালকনিতে গিয়ে বসল। বেয়ারা কফি দিয়ে গিয়েছিল। অন্যমনস্কর মতো চুমুক দিতে দিতে আনমনা দূরের ট্রাম রাস্তার দিকে আছে সে। রাস্তায় প্রচুর ভিড়। মানুষজন থিক থিক করছে। তা ছাড়া যানবাহনের স্রোত। নানা ধরনের আওয়াজ ভেসে আসছে। কোনও দিকেই তার লক্ষ নেই, শব্দ-টব্দও যেন কানে আসছে না। অদৃশ্য কোনও স্ক্রিনে হাই পাওয়ার কমিটির মিটিং আর প্রেস কনফারেন্সের দৃশ্যগুলো যেন বারবার ফুটে উঠছে।

আচমকা ফোন বেজে উঠল। এ সময় কে ফোন করতে পারে? একটু চমকই লাগল অশোকের। কফির মগটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে ফোনটা তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো—'

অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এল— 'কনগ্র্যাচুলেশনস—'

চেনা কণ্ঠস্বর। সোমদেব চ্যাটার্জি। রীতিমতো অবাক হয়েই অশোক জিগ্যেস করল, 'কীসের অভিনন্দন চ্যাটার্জি সাহেব?'

'বা রে, যুদ্ধের ফার্স্ট রাউন্ডটা জিতে গেলে। এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্টের জন্যে একটা অভিনন্দন তোমার প্রাপ্য নয়?'

'কোন যুদ্ধের কথা বলছেন?'

'ইউ আর হাইলি ইনটেলিজেন্ট। ইয়ং ম্যান। এটুকু বুঝতে পারছ না?'

অশোক চুপ।

সোমদেব বললেন, 'হাই পাওয়ার কমিটির' চারজন দুর্ধর্ষ মেম্বারকে ঘায়েল করে শ্রমিকদের জন্যে আশি-নব্বই কোটি টাকা খরচ করে তিনটে টাউন তৈরির প্রোজেক্ট আদায় করে ছেড়েছ। এটা যুদ্ধ নয়? দাঁতে দাঁত চেপে কী ধরনের লড়াই তোমাকে করতে হয়েছে তা কি আর বুঝতে পারিনি?'

অশোক একটু ভেবে বলল, 'আপনি এই হাউসে আর আসেন না। রাজপাট আমার হাতে তুলে দিয়ে দূর সরে আছেন। তবু আগেও টের পেয়েছি এখানে কী ঘটছে, কে কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, সব খবর আপনার কাছে মুহূর্তে পৌঁছে যায়। আজকের হাই পাওয়ার কমিটির মিটিংয়ে যা যা ঘটেছে তাও আপনি জেনে গেছেন, এতে আমি অবাক হচ্ছি না।'

সোমদেব উত্তর দিলেন না, হালকা শব্দ করে একটু হাসলেন।

অশোক বলল, 'সে যাক, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আশা করি সঠিক জবাবটা পাব—'

'অবশ্যই, যদি জবাবটা আমার জানা থাকে। বল তোমার কী প্রশ্ন—'

'আজ আমাকে যে অভিনন্দনটা জানালেন সেটা তো অনেক আগেই আপনি পেতে পারতেন।'

'মানে?'

'আপনি এই হাউসের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ছিলেন হাই পাওয়ার কমিটির চেয়ারম্যান। আপনার স্পেশাল ক্ষমতার জোরে বজবজ, শ্যামপুর আর হুগলির নরককুণ্ডগুলো ভেঙে ওয়ার্কাররা যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। করলেন না কেন? মানুষ তো আপনাকে মাথায় করে রাখত।'

কিছুক্ষণ আগে মৃদু শব্দ করে হেসেছিলেন সোমদেব। এবার তাঁর হাসির আওয়াজটা অনেক বেশি জোরালো। অশোক যা বলেছে এমন মজার কথা তিনি খুব সম্ভব কখনও শোনেননি। হাসি থামিয়ে এক সময় বললেন, 'অশোক, তোমার স্মৃতিশক্তিটা যে খুব ভালো তা আমার জানা আছে। এই হাউসে তুমি যখন এলে তার আগে কী কথা হয়েছিল নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। বলেছিলাম তোমার ক্লাস ক্যারেক্টার অর্থাৎ শ্রেণীচরিত্র আর আমার শ্রেণী চরিত্র টোটালি ডিফারেন্ট। আকাশ-পাতাল তফাৎ। তোমার টপ প্রায়োরিটি হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, আর সোসাইটির জন্য সব ব্যাকওয়ার্ড পিপল। অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব নীচের লেভেলের মানুষ। আমি ট্রাডিশনাল শিল্পপতি। ইন্ডাস্ট্রি আর আপার ক্লাসের স্বার্থ দেখি।'

অশোক বলল, 'মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।'

সোমদেব বললেন, 'তুমি জাস্ট একটা হার্ডল পার হয়েছ। সামনে অনেক উঁচু উঁচু হার্ডল। যে মিশন নিয়ে এসেছ তা পূরণ করতে হলে সেগুলোও পেরুতে হবে।'

'চেষ্টা করব। ব্যাটলফিল্ডে যখন একবার ঢুকে পড়েছি, সহজে পালিয়ে যাব না।'

'দ্যাট শুড বি দা স্পিরিট—'

॥ চোদ্দো ॥

একদিন পর বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি— নানা ভাষার পত্র-পত্রিকার মর্নিং এডিশনে প্রেস কনফারেন্সের খবরটা প্রথম পাতায় সিকিভাগ জুড়ে ছাপা হল। সেই সঙ্গে বজবজের ভাঙাচোরা ব্যারাক, সেখানকার হাড়পাঁজির বের হওয়া বুড়োবুড়ি, অপুষ্টিতে ভোগা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছবির পাশাপাশি অশোকেরও একটা বড় ছবি ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে কীভাবে ওই হাজার রকমের দুষণ আর উৎকট দুর্গন্ধে ভরা পরিবেশে কীভাবে জীবন কেটে যাচ্ছে তাই নিয়ে ওখানকার মহিলা আর পুরুষদের ছোট ছোট ইন্টারভিউও বেরিয়েছে। হাউসের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হঠাৎ চলে যাওয়ায় এলাকার মানুষজন যতটা অবাক তার চেয়ে অনেক বেশি আপ্লুত। অশোকের কাছে তাদের বিপুল প্রত্যাশা। তারা তাকে ঈশ্বর ভাবতে শুরু করেছে।

প্রেস কনফারেন্সে অশোক জানিয়েছে, ব্রিটিশ আমলের

কলোনিয়াল সেশ্যান প্যাটার্ন বা সামাজিক বিন্যাস পাল্টে দেওয়ার স্বপ্ন তার অনেকদিনের। বজবজ, শ্যামপুর, হুগলিতে তাদের ওয়ার্কারদের জন্য যে নরকগুলো আজও আছে সেখান থেকেই শুরুটা সে করতে চায়।

অন্য দিনের মতো সকালে ঘুম ভাঙার পর ম্যাসাজ স্নানটানের পর পোশাক বদলে, ব্রেকফাস্টের পর্ব শেষ করে ড্রইংরুমে এসে আজকের মর্নিং এডিশনের কাগজগুলো দেখছিল অশোক। রাহেজা চলে এলেন। রোজ অনেক আগেই আসেন। আজ বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেছে। বিব্রতভাবে বললেন, 'গুড মর্নিং স্যর, ঘরের একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। আধঘন্টা লেট হয়ে গেল। আই অ্যাম সরি—'

'কোনও দিন দেরি একটু হতেই পারে। সেটা এমন কিছু অপরাধ নয়। বসুন—'

রাহেজা বসে পড়লেন। অশোক জিগ্যেস করল, 'আজকের কাগজ দেখেছেন?'

রাহেজা একটা ইংলিশ ডেইলি রাখেন। বললেন, 'দেখেছি স্যার। বজবজের ব্যাপারটা ছবি-টবি দিয়ে খুব বড় করে কভার করেছে। প্রেস কনফারেন্সে জার্নালিস্টরা যা যা প্রশ্ন করেছে আর আপনি যা উত্তর দিয়েছেন, সে সবও বাদ যায়নি।'

'এই কভারেজের রি-অ্যাকশন কীরকম হবে বলে মনে হয়?'

'কতটা কী হবে, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কিছু একটা নিশ্চয়ই হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অশোক বলল, 'ক'দিন হল আমার মাথায় একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জবাবটা আপনি হয়তো দিতে পারবেন।'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন রাহেজা।

অশোক বলল, 'আমি তো মাত্র কিছুদিন হল এই হাউসে এসেছি। এখানকার সমস্ত কিছু জেনে উঠতে পারিনি। এত কম সময়ে জানা সম্ভবও নয়। প্রশ্নটা হল, এই হাউসের ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার, ক্লার্ক, টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার ছাড়াও ছোটখাট নানা কর্মী, ক্লাসফোর টাইপের এমপ্লয়িস— এরা কি ব্রিটিশ আমলের পে-স্কেল অনুযায়ী মাইনে পেয়ে আসছে?'

একটু ভেবে রাহেজা বললেন, 'আপনাকে আগেই বলেছি, স্বাধীনতার ঠিক পর পর যে সব ফ্যাক্টরি আর অফিসগুলো মালিকানা বদল হয়ে এই হাউসের হাতে এল, সেগুলোর এমপ্লয়িদের তো বটেই, ফর্টি সেভেনের অনেক আগে থেকেই এই হাউসের বেশ কিছু কলকারখানা, অফিস-টফিস ছিল, সেগুলোর বিরাট এক্সপ্যানসনও হয়েছে— এসবের এমপ্লয়িদেরও মাইনে-টাইনে খুব ভালো নয়।'

'তার মানে ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের লিগ্যালিস এখানকার মালিকদের ঘাড় থেকে নামছেই না।'

দ্রুত শুধরে নেবার ভঙ্গিতে রাহেজা বললেন, 'স্যার, আমার একটু ভুল হয়ে গেছে—'

'কীসের ভুল—'

'ফর্টি সেভেনে দুশো বছরের পরাধীনতা ঘুচে যাবার পর আনন্দে, আবেগে সারা দেশ যখন ভাসছে, খুব সম্ভব কয়েকদিনের জন্যে ব্রিটিশ লিগ্যাসির কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন হাউসের মালিকরা। মহাভারতের দাতাকরণ (কর্ণ) বোধ হয় তখন তাঁদের ঘাড়ে চেপেছিলেন। সব এমপ্লয়িকে তাঁরা কিছু কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।'

'সে তো শুনেছি। কিন্তু সেটা কত?'

'বারো-চোদ্দো বছর আগের কথা। ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে তেমন কিছু নয়। খোঁজ-খবর নিয়ে দু-তিনদিনের মধ্যে আপনাকে জানাতে পারব।'

'থ্যাংক ইউ। আচ্ছা—'

'বলুন স্যর—'

'সেই যে সামান্য বাড়ানো হয়েছিল, তারপর নতুন কোনও পে-স্কেল করা হয়েছে?'

'না স্যর, ইউনিয়নগুলো অনেকবার দরবার করেছে, কিন্তু মালিকরা তাদের কথায় তেমন কান দেয়নি।'

'আই সি—'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা। তারপর দু'জন বেরিয়ে পড়ল।

॥ পনেরো ॥

একুশ-তলা অফিস বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে বিশাল লাউঞ্জের বাঁ দিকে চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টরদের এবং টপ এগ্‌জিকিউটিভদের জন্য তিনটে এক্সক্লুসিভ লিফ্‌ট। লাউঞ্জের ডান দিকে অন্য কর্মী এবং ভিজিটরদের জন্য আরও পাঁচটা লিফ্‌ট। মাঝখানে রিসেপশন ছাড়াও এই হাউসের দু-তিনটে কোম্পানির কয়েকটি সেকশনও রয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে লাউঞ্জে এসে বাঁ দিকের স্পেশাল লিফ্‌টগুলোর দিকে যাচ্ছিল অশোক আর রাহেজা। অন্য কর্মীরা এই তিনটে লিফ্‌ট ব্যবহার করতে না পারলেও চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টরদের প্রাইভেট সেক্রেটারিরা তাঁদের সঙ্গে ওঠানামা করতে পারেন।

অন্য দিন অশোককে দেখলে গ্রাউন্ড ফ্লোরের কর্মীরা উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে; কেউ কেউ কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম ঠোকে। আজ সবাই তাদের কামরাগুলো থেকে লাউঞ্জে বেরিয়ে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার-টমস্কার করছে।

অশোক অন্য দিনের মতো হাতজোড় করে রাহেজাকে নিয়ে একটা লিফ্‌টে ঢুকল। সে বেশ অবাকই হয়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার রাহেজা, আমাদের এমপ্লয়িদের ভক্তির মাত্রাটা যেন আজ অনেক বেশি! কিছু বুঝতে পারলেন?'

'নো স্যর। আপনি পারমিশন দিলে খবর নিতে পারি।'

কৌতূহল হচ্ছিল। অশোক বলল, 'নেবেন। তবে—' বাকিটা শেষ না করে থেমে গেল।

কর্পোরেট হাউসে কাজ করে করে চুল প্রায় পাকিয়ে ফেলেছেন রাহেজা। অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ক্ষুরধার পর্যবেক্ষণ শক্তি। অশোকের সঙ্গে তো বেশ কিছু দিন কেটে গেল। সে কখন কী চায়, পুরোটা না বললেও ঠিক ধরে ফেলেন। বললেন, 'স্যর, কেউ বুঝতে পারবে না, আমি ঠিক জেনে নেব।'

অশোক একটু হাসল।

লিফট্ তাদের ফিফটিনথ ফ্লোরে পৌঁছে দিল। নিজের চেম্বারে চলে এল অশোক। চেম্বারের দরজা অবধি একসঙ্গে এসে নিজের ছোট একটি কামরায় গিয়ে ঢুকলেন রাহেজা।

অশোকের চেম্বারের একধারে বসে ছিল পার্লা তার ছোট টেবিলটার ওপাশে। অশোককে দেখে উঠে দাঁড়াল, 'গুড মর্নিং স্যর—'

'গুড মর্নিং, সিট ডাউন—' অশোক তার চেয়ারটিতে গিয়ে বসল।

পার্লও বসে পড়েছে। বলল, 'স্যর, আজকের পেপারে খবরটা পড়লাম। এই হাউসে এটা একটা বিরাট ব্যাপার। হাজার হাজার ওয়ার্কার আপনার কাছে হোল লাইফ গ্রেটফুল হয়ে থাকবে।' উচ্ছ্বাস থাকলেও তার বলার মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে।

অশোকের ভালোই লাগল, তবে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কোনও ফোন এসেছিল।'

'প্রচুর স্যর। এঁরা সবাই আপনাকে কনগ্র্যাচুলেট করেছে।'

খুব একটা গুরুত্ব দিল না অশোক। জানতে চাইল, 'আর কেউ?'

'এই হাউসের সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন 'শ্রমিক কল্যাণ সমিতি'র প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ফোন করেছিলেন।

অশোক একটু ভাবাক হল, 'তিনি কী চাইছেন?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। পনেরো মিনিটের জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছেন।'

'করে?'

'স্যর, যদি আপনার বিজি শিডিউলের মধ্যে যদি সময় হয়—আজই।'

'কী কারণে দেখা করতে চান, ইন্দ্রজিৎবাবু তা কি জানিয়েছেন?'

'নো স্যর। যা বলার আপনাকেই বলবেন।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কী ভেবে অশোক বলল, 'দেখুন তো অফিসে আমি কোন সময়টা মোটামুটি ফ্রি আছি?'

ডায়েরি খুলে দেখে নিল পার্লা তারপর বলল, 'লাঞ্চের আগে একটা থেকে দেড়টার মধ্যে হাফ-অ্যান আওয়ার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।'

'ঠিক আছে। আপনি একটায় ইন্দ্রজিৎবাবুকে আসতে বলে দিন—'

'ইয়েস স্যর, এক্ষুনি জানিয়ে দিচ্ছি।' পার্ল ফোনের দিকে হাত বাড়াল।

টেবিলের ওপর দু-তিনটে ফাইল পড়ে আছে। দিন চারেক আগে অফিসের কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে দিয়ে গিয়েছিল। অশোক একবার ভাবল, ওগুলো দেখে নিজের মতামত লিখে দেয়। কিন্তু কেমন একটা আলসেমি লাগছে। না, এখন থাক, লাঞ্চের পর দেখা যাবে। পিঠটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিতে যাবে, চোখে পড়ল, পার্ল ফোনটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখছে। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে নিশ্চয়ই তার কথা হয়ে গেছে। আমাকথা কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় হেলান দেওয়া আর হল না। শিরদাঁড়া টানটান করে বলল, 'আরেকটা কথা মিস শেঠনা—'

পার্ল উৎসুক চোখে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার বিলিমোরিয়া, মিস্টার সান্ধু বা মিস্টার ভট্টাচারিয়ারা কি ফোন করেছিলেন?'

'নো স্যর—'

মর্নিং এডিশনের কাগজগুলোতে খবরটা বেরিয়েছে। হাই পাওয়ার কমিটির মেম্বারদের চোখে কি আর তা পড়েনি? কিন্তু তাঁদের দিক থেকে কোনও রকম সাড়া-শব্দ নেই। পরক্ষণে খেয়াল হল, ওঁদের প্রতিক্রিয়া যদি হতো, পার্লের মতো একজন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে ফোন করবেন কেন? তার সঙ্গেই তো সোজাসুজি কথা বলতেন। মনে পড়ছে সেদিনকার মিটিংয়ে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা উটকো ছোকরার কাছে ধরাশায়ী হবার পর হাই পাওয়ার কমিটির মহা ক্ষমতাবান চারজন মেম্বারের মুখ থমথমে হয়ে গিয়েছিল। এত বড় একটা ডিফিট তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। তারপর প্রেস কনফারেন্সে মিটিয়ে যা যা ঘটেছে, মিডিয়াকে সব জানিয়ে দেওয়া এবং আজকের কাগজে সেগুলো প্রথম পাতায় ছাপা হয়ে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়া— এত কিছু হজম করা তাঁদের পক্ষে খুবই শক্ত। খুব সম্ভব আপাতত তাঁরা এই ব্যাপারটায় মুক এবং বধির হয়ে থাকবেন। মনে মনে একটু হাসল অশোক।

এখন এগারোটা বেজে সাতাশ। এই সময় হাউসের কয়েকজন টপ এগ্জিকিউটিভের আসার কথা। একের পর এক তাঁরা এসে নানা কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে যেতে থাকে লাগলেন।

সইয়ের পর্বটা শেষ হতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। হঠাৎ অশোকের চোখে পড়ল, চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন রাহেজা। মনে পড়ল আজ অফিসে ঢোকার পর কর্মীদের চোখে-মুখে একটু বাড়তি ভক্তি চোখে পড়েছিল। রাহেজাকে কারণটা জেনে আসতে বলেছিল সে। খুব সম্ভব সেই খবরই তিনি নিয়ে এসেছেন।

অশোক ডাকল, 'কাম ইন মিস্টার রাহেজা—'

রাহেজা ভেতরে এসে টেবিলের ওপর দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে নিচু গলায় বললেন, 'আজকের নিউজ-পেপারের রিপোর্টটা ওরা পড়েছে। এই নিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজিত। শুধু গ্রাউন্ড ফ্লোরের এমপ্লয়িরাই নয়, সব ফ্লোরের সমস্ত এমপ্লয়িরা। আপনাকে ওরা ভগবান ভাবতে শুরু করেছে। বজবজ, শ্যামপুর, হুগলির কারখানাগুলোর ওয়ার্কারদেরই শুধু নয়, এদেরও অনেক ডিমান্ড। ওদের বিশ্বাস আপনি সবার সব ইচ্ছে পূরণ করবেন—'

অশোক হাসল, 'এই হাউসে এসে ভগবান বনে গেলাম। মন্দ কী। যাক, আপনি নিজের কামরায় গিয়ে বসুন। একটায় 'শ্রমিক কল্যাণ সমিতি'র প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আসবেন।

রাহেজা বেরিয়ে গেলেন। কটায় কটায় একটায় ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী এলেন। নমস্কার প্রতি নমস্কারের পর তাঁকে বসিয়ে অশোক জানতে চাইল, 'বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'স্যর, বজবজ, শ্যামপুর আর হুগলির ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের কোয়ার্টারগুলো মেরামত করে দেবার জন্যে বারবার হাউসের কর্তাদের কাছে আর্জি জানিয়েছি, কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেননি।'

রাহেজা এসব তাঁকে আগেই জানিয়েছিলেন। অশোক চুপ করে রইল।

ইন্দ্রজিৎ থামেননি, 'মাত্র কয়েক মাস হল, আপনি এখানে এসেছেন, এর মধ্যেই যা করলেন, ভাবা যায় না। শ্রমিকদের তরফ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি। তা ছাড়া—'

'কৃতজ্ঞতার কথা থাক। তাছাড়া আর কী, সেটা বলুন—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আরও কিছু ডিমান্ড আছে।'

'আপনাদের ডিমান্ডের লিস্ট তো আমাকে দেবার কথা নয়। সেসব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে দিতে হবে। তিনি তা হায়ার অথরিটির কাছে পাঠিয়ে দেবন। সিদ্ধান্ত যা নেবার হায়ার অথরিটিই তা নেবেন। এটাই এই হাউসের নিয়ম। ট্রেড ইউনিয়ন লিডার হিসেবে আপনার এটা জানা উচিত।'

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ব্যস্তভাবে বললেন, 'জানি স্যার। চার্টার অফ ডিমান্ডস তৈরি করা হচ্ছে। খুব শিগগিরই আমরা তা সঠিক জায়গায় পেশ করব। আমি শুধু শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া কী আছে

আপনাকে তা মৌখিকভাবে জানাতে চাই। অনুগ্রহ করে যদি শোনেন—'

অশোক আগেই শুনেছে, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী এই হাউসের কোনও কারখানারই শ্রমিক নন বা অন্য কোনও পদেও নেই। তবু শ্রমিক নেতা। সে বলতে যাচ্ছিল, শ্রমিকদের যদি কিছু দাবি-দাওয়া থাকে তা তাদেরই জানানো উচিত। কী ভেবে আর বলল না। ইন্দ্রজিতের দিকে তাকাল, 'ঠিক আছে, বলুন—'

'আপাতত আমাদের দুটো ডিমান্ড। ওয়ার্কারদের জন্যে যেমন পুরনো ব্যারাকগুলো ভেঙে নতুন বাড়ি-ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে, তেমনি অন্য সব সাধারণ এমপ্লয়ি আর ক্লাস ফোর স্টাফের কর্মীদের থাকারও ব্যবস্থা করতে হবে। আর ব্রিটিশ আমলে হাউসের কর্মীরা যা মাইনে পেত, স্বাধীনতার পর তা যৎসামান্য বেড়েছে। পে-স্কেল রিভাইস করে দ্বিগুণ করতে হবে।'

পে-স্কেলের ব্যাপারটা রাহেজার কাছে আগেই শুনেছিল অশোক। কয়েক হাজার ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার বাদে বাকি সাধারণ এমপ্লয়িদের জন্য কোয়ার্টার বানিয়ে দেবার দাবিটা নতুন। কিন্তু দুটো দাবিই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে।

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, আমার মনে থাকবে।'

'নমস্কার স্যার, অনেক ধন্যবাদ—' ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী উঠে পড়লেন।

লাঞ্চের পর প্রথম যাঁর ফোনটা এল তাঁর নাম শুনেই চমকে উঠল অশোক। মিস্টার মগনভাই প্যাটেল। একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের চেয়ারম্যান। তিনি যে ফোন করবেন ভাবা যায়নি। চমকটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল। তারপর সসম্ভ্রমে বলল, 'গুড আফটারনুন স্যার—' ফোনটা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছেন, তাই তো?

অশোক বলল, 'তা একটু হয়েছি। তবে আপনার ফোন পাওয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। ইট'স মাই প্রিভিলেজ—'

'সৌজন্য আর ভদ্রতার জন্যে ধন্যবাদ।' মগনভাই বললেন, 'কিন্তু আপনার জন্যে তো আমি এখন থেকে পিসফুলি ঘুমোতে পারব না।'

মগনভাই প্যাটেলকে ক্লাবে দু-চারবার মাত্র দেখেছে অশোক। একটু গম্ভীর ধরনের মানুষ। কিন্তু মুখে সব সময় মৃদু হাসি। দেখা হলে সামান্য দু-চারটে কথা। কুশল বিনিময় টাইপের। কিন্তু তার জন্য প্যাটেল সাহেবের ঘুমের বিঘ্ন ঘটবে, এমন দুরূহ কখনও সে করেছে কি না, মনে করতে পারল না। বিরতভাবে বলল, 'স্যার, আমার জন্যে—'

মগনভাই বললেন, 'আজকের নিউজ-পেপারে আপনাকে নিয়ে যে ফার্স্ট-পেজ রিপোর্টটা বেরিয়েছে তারপর আমাদের মতো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের হাই ডোজের সিডেটিভ ছাড়া ঘুম আসবে না! আরও একটু বুঝিয়ে বলছি, আপনাদের হাউসের মতো আমাদের হাউসও ইন্ডিপেনডেন্সের পর পর ইংরেজদের কলকারখানা কিনেছিল। তাদের জন্য ব্রিটিশ টাইকুনরা যেসব কোয়ার্টার বানিয়েছিল, সেগুলোতে এখনকার ওয়ার্কাররা থাকে। আজকের রিপোর্টটা পড়ার পর আমাদের অফিসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। খুব সম্ভব তারাও পুরনোগুলো ভেঙে নতুন কোয়ার্টার চাইবে। কী পরিমাণ ওয়েস্টেজ অফ মানি— ভাবতে পারেন?'

এ কী বলছেন মগনভাই? অর্থের বিপুল অপচয়! অশোক বলল, 'আমাদের ওয়ার্কারদের তো একটু ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত—'

'আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যেমনই হোক, যেখানেই রুট থাক, আপনি এখন কাম্পির টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আপনার মুখে ট্রেড ইউনিয়নদের মতো স্লোগান টাইপের কথা মানায় না। ছাড়ছি—' মগনভাই লাইন কেটে দিলেন।

মগনভাইয়ের পর মিস্টার হিম্মৎসিংকা, তারপর যুগলপ্রসাদ

BANKURA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

Head Office: Machantala, Bankura (W.B.)
Phone: (03242) 250302, 253458, FAX: 03242 255987
Email: bdccb_ltd2006@rediffmail.com

A Bank for the people of Bankura with licence from Reserve Bank of India with the following services through its 19 Branches:

- Free accident insurance with Savings Deposit
- Accident Insurance(PMSBY) Rs.2 Lacs. Yearly premium Rs.12/-
- Life Insurance(PMJJBY) Rs.2 Lacs. Yearly premium Rs.330/-
- Highest Agricultural loans in the district to small and marginal farmers
- RuPay KCC and Micro ATM facility for farmers
- Cash credit loans for business
- Term loans for business
- Personal loans for service holders
- Loan against NSC / KVP / Bank's Term Deposit
- Housing loans
- J.L.G. / S.H.G. loans to more than 12000 S.H.G.s
- Locker facility
- General Banking with Core Banking Facilities, ATM, NEFT, RTGS, POS, NACH

জৈন, আমনদীপ গ্রেওয়াল, এন রাধাকৃষ্ণাণ, গোপাল রেড্ডি, মণিমোহন ঘোষ এবং আরও কয়েকজন। এঁরা সবাই বড় বড় সব হাউসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের একেকজন জ্যোতিষ। সকলেই অশোকের দিকে আঙুল তুলেছেন। জানিয়েছেন, সে যা করেছে তার আঁচ গিয়ে পড়েছে তাঁদের হাউসগুলোতেও। যে কোনও মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠবে। তার ফল হবে মারাত্মক। শিল্পের প্রবেশ এতদিন শান্তই ছিল। অশোকের জন্য সমস্ত কিছু তোলপাড় হয়ে যাবে।

॥ ষোলো ॥

দশ-বারো দিন কেটে গেল। এর মধ্যে অশোকদের অফিসের বাইরে দেওয়ালে দেওয়ালে দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রচুর পোস্টার লাগানো হয়েছে। কাজের সময় কেউ গোলমাল করছে না কিন্তু লাঞ্ছনেকে কী ছুটির পর কর্মীরা জড়ো হয়ে তুমুল স্লোগান দিচ্ছে।

'সব কর্মীর জন্য—'

'কোয়ার্টার দিতে হবে—'

'দিতে হবে, দিতে হবে—'

'পে-স্কেল পাল্টাতে হবে—'

পাল্টাতে হবে, পাল্টাতে হবে—'

অশোক খবর পেয়েছে,তাদের হাউসেই শুধু নয়, সংক্রমণ ছড়িয়েছে অন্য হাউসগুলোতেও। অফিসপাড়ার আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত। বোঝা যাচ্ছে এই উত্তাপ গনগনে মশালের চেহারা নিয়ে শহরের কাছাকাছি এবং দূরের কারখানাগুলোর দিকে ধেয়ে যাবে।

আরও কয়েক দিন বাদে এক বুধবার বিলিমোরিয়া ফোন করে জানালেন, তাঁরা এখন অশোকের চেম্বারে আসতে চান। গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা আছে। অশোকের অনুমতি পেলে আসবেন।

অশোক ব্যস্তভাবে বলল, 'অবশ্যই আসুন-আসুন।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিলিমোরিয়ারা চলে এলেন। অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন। বি সিটেড।

হাইপাওয়ার কমিটির মেম্বাররা বললেন আপনি আগে বসুন—।'

সবাই পড়লে অশোক জিগ্যেস করল, আজকের এই মিটিংয়ের বিষয়টা কী?'

খুক খুক করে কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে সান্ধু বললেন, 'স্যর বিষয়টা হলেন আপনি—'

মানে বলে পার্লের দিকে তাকাল অশোক, 'মিস শেঠনা, আপনি কিছুক্ষণ মিস্টার রাহেজার কামরায় গিয়ে বসুন। পরে আপনাকে ডেকে নেব।'

পার্ল চলে গেল।

সুইচ টিপে বাইরে লাল আলো জ্বালিয়ে দিল অশোক। লাল বাতি মানে চেম্বারে অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ।

বিলিমোরিয়া বললেন, 'একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে।'

'নট অ্যাট অল—' অশোক একটু হেসে বলল, 'কারণটা কী, বুঝতে পারছি। ওয়ার্কারদের অ্যাজিটেশন কিন্সিয়ই?'

বিলিমোরিয়ার সঙ্গে হাই পাওয়ার কমিটির অন্য তিন মেম্বারও এসেছেন। সবার মুখ থমথমে।

বিলিমোরিয়া বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। ইন্ডিপেনডেন্সের পর চোদ্দো-পনেরো বছরে এরকম আন্দোলন কখনও হয়নি। আপনি এই হাউসের টপমোস্ট পার্সন। হাই পাওয়ার কমিটিরও চেয়ারম্যান। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ওকে—' অশোক মাথা নাড়ে।

সান্ধু বললেন, 'ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?'

এঁরা যে তার গতিবিধির ওপর সারাক্ষণ নজর রাখে অশোক তা জানে। সে সতর্ক হয়ে গেল। — 'হ্যাঁ এসেছিলেন।' ওঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে চাইলেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি, চার্টার অফ ডিমান্ড হাউসের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দেওয়া, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে দিতে হয়। সেটা নিশ্চয়ই একজন ট্রেড ইউনিয়ন লিডারের জানা আছে। এরপর আর কোনও কথা হয়নি। ইন্দ্রজিৎবাবু চলে গিয়েছিলেন।'

ভট্টাচারিয়া বললেন, 'ইউনিয়ন ওয়ার্কারদের চার্টার অফ ডিমান্ডস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের দপ্তরেই জমা দিয়েছে। সেখান থেকে আমাদের কাছে এসেছে। প্রক্রিয়া চলি আছে। কিন্তু স্যর, আপনার সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী দেখা করে যাবার পর অ্যাজিটেশনটা কেন এত বিরাট আকার নিল সেটা আমাদের ভাবাচ্ছে—'

অশোক সোজাসুজি তাকাল, 'ভট্টাচারিয়া সাহেব, আপনাদের কি ধারণা, আমি ওদের উস্কে দিয়েছি?'

ভট্টাচারিয়া থতমত। বললেন, 'না, তা ঠিক নয়। সে যাক—' চকিতে প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, 'ওদের চার্টার অফ ডিমান্ডে কী কী আছে, ডিটেলে আপনি কি তা জানেন?'

'জানি তো। ওরা স্লোগান দিচ্ছে— শুনতে পাই। দেওয়ালে পোস্টার লাগিয়েছে, দেখতে পাই—'

'ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের জন্যে নতুন কমপ্লেক্স বানাতে হবে তিনটে আলাদা আলাদা প্লেসে। টাউন প্ল্যানারদের নিয়ে বসেছিলাম। আমাদের এস্টিমেট ছিল আশি থেকে নব্বই কোটি টাকা। প্ল্যানাররা একশো দশ কোটির টাকার নীচে নামল না। আপনার ইচ্ছেয় এই কমপ্লেক্সগুলো হবে। একশো দশেই রাজি হতে হল। অ্যাডভান্সও করতে হয়েছে। এরপর যা ডিমান্ড তা তো মারাত্মক।

'কীরকম?'

'আপনি তো জানেন ফ্যাক্টরি ওয়ার্কাররা ছাড়াও আমাদের হেড অফিস আর ব্রাঞ্চ অফিসগুলোতে কয়েক হাজার এমপ্লয়ি রয়েছে। তাদের জন্যে হাউসিং কমপ্লেক্স বানাতে কত কোটি টাকা লাগবে ভাবতে পারেন? এর সঙ্গে স্যালারি দ্বিগুণ করার দাবি রয়েছে।'

'জানি।'

'সব মেনে নিলে হাউসের আর্থিক অবস্থা ধসে পড়বে।'

'ভট্টাচারিয়া সাহেব, ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার ছাড়া অন্য এমপ্লয়িদের জন্য হাউসিং কমপ্লেক্স বানাতে আরও হয়তো এক-দেড়শো কোটি টাকা লাগবে। আমি গত কয়েকটা আর্থিক বছরের খবর নিয়েছি। আমাদের হাউসের আয় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। লাস্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ারে রেকর্ড আয় হয়েছে। ফ্যাক্টরির শ্রমিক ছাড়া অন্য এমপ্লয়িদের ভালো থাকার জন্যেও এটুকু করে দেওয়াই যায়। তাতে হাউসের আর্থিক স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হবে না।'

ভট্টাচারিয়া অবাক হলেন না। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এই ছেলেটা যে আদৌ আনাড়ি নয়, এই হাউসের অনেক তথ্যই যে সে জোগাড় করেছে, আগেও তা টের পেয়েছেন তিনি। কোত্থেকে পাচ্ছে এসব? নিশ্চয়ই হাউসের কেউ কেউ গোপনে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। নজর রাখাটা খুব জরুরি। বললেন, 'স্যার, একসঙ্গে এত প্রোজেক্ট হাতে নেওয়ার অসুবিধা আছে। হাউসিং-টাউসিং-এর ব্যাপারটা আপনার এক্তিয়ারে। আপনি যখন চাইছেন, ওটা তো করতেই হবে। তবে এখনই নয়।'

অশোক বলল, 'ঠিক আছে, পরেই হোক। হাই পাওয়ার কমিটির একটা মিটিং ডেকে এই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তার লিখিত রেকর্ড রাখতে হবে।'

ছোকরা অতীব হুঁশিয়ার। ভট্টাচারিয়া মনে মনে তার তারিফ করলেন। মুখে বললেন, 'অবশ্যই স্যার। এবার পে-স্কেল হাইকের ব্যাপারটা আলোচনা করা যেতে পারে।'

'ওটা হাই পাওয়ার কমিটির এক্তিয়ারে। আমি কমিটির একজন। আলোচনা—'

অশোককে থামিয়ে দিলেন ভট্টাচারিয়া, 'আপনি স্যর, খুব মডেস্ট। —বিনয়ী। এই কমিটির একজনই নন, চেয়ারপার্সন। সরি ফর ইন্টরাপসনশন—'

অশোক হাসল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাইরে মাইনে বাড়াবার জন্যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেটা থামানোর জন্যে ইমিডিয়েটলি একটা সলিউশন দরকার।'

সান্ধু বললেন, 'অবশ্যই। সলিউশন কী হতে পারে?'

অশোক বলল, 'একটা ব্যাপার ভেবে দেখুন, স্বাধীনতার ঠিক পরে পরে এই হাউসের সব শ্রেণীর কর্মীর সামান্য কিছু মাইনে বেড়েছিল। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে। জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কষ্ট অফ লিভিংও। স্যালারি তো বাড়ানোই উচিত—'

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, গলা খাকরে আগরওয়াল তার কথার মধ্যে ঢুকে গেলেন, 'ব্যানার্জি স্যার, এম্প্লয়িরা স্যালারি ডাবল করতে বলছে। দিন-রাত ক্লোগান দিচ্ছে। ভয় দেখাচ্ছে স্ট্রাইক ভি করবে। আপনি বিবেচনা করুন, 'স্যালারি ডাবল করতে হলে হাউসের হাল কী হবে?'

'হাউসের ফিনান্সিয়াল হালের কথা একটু আগেই হচ্ছিল। হাল যে যথেষ্ট ভালো আপনি তা আমার থেকে অনেক বেশি জানেন। ইউনিয়নের সঙ্গে বসুন। কথা বলে একটা সমঝোতায় আসুন। তবে ওরা যাতে নিজেদের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে সে দিকটা দেখুন—'

'স্যর, আপনি এই হাউসে জয়েন করার পর থেকে বুঝতে পেরেছি একজন মানবতাবাদীকে পেয়ে গেলাম। শ্রমিকদের ওপর আপনার খুব সিমপ্যাথি, প্রেম—'

লোকটা কি তাকে খোঁচা দিল। স্থির দৃষ্টিতে আগরওয়ালের দিকে তাকায় অশোক, 'গরিব মানুষদের ওপর সিমপ্যাথি, প্রেম থাকাটা কি অন্যায়?'

আগরওয়াল আঁতকে ওঠার ভান করল, 'নেহি, নেহি স্যার, ভালোভাবে থাকতে হলে স্যালারি দু'গুণা কেন, চারগুণা, ছে'গুণা করে দিতে হয়। লেকিন তা কি সম্ভব?'

'বেশি দিন করবেন না, দু-একদিনের মধ্যে ইউনিয়নকে ডাকুন। স্যালারি কতটা বাড়ানো সম্ভব ওদের বুঝিয়ে বলুন। ওরা কতটা নামতে পারে, শুনুন। কথা বলতে বলতে একটা জায়গায় নিশ্চয়ই পৌঁছানো যাবে। কাজটা স্মুদলি হবে বলেই আসা করি। স্ট্রাইক ডাকলে প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে। হাউসের যা ক্ষতি হবে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি এম্প্লয়িদের। এই পয়েন্টের ওপর জোর দেবেন।'

আগরওয়াল বললেন, 'ওরা ভীষণ জিদ্দি। ডাবল-এর নীচে নামবে বলে মনে হয় না।'

'তা হলে ডাবলই দিতে হবে।'

'কী বলছেন স্যার!' আগরওয়াল প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

অশোক হেসে হেসে বলল, 'ইন্ডিপেনডেন্সের পর এতগুলো বছরে ওদের স্যালারি আর কতটুকুই বেড়েছে! এবার না হয় বেশি দিয়ে কিছুটা পুষিয়ে দিলেন।'

বিলিমোরিয়া ধীর, স্থির, ঠান্ডা মাথার মানুষ। কিন্তু চতুর খেলোয়াড়। এতক্ষণ চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করতে করতে সবার কথা শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন, 'ব্যানার্জি সাহেব স্যার, এতক্ষণ খুব ভালো সাজেশন দিচ্ছিলেন। কোয়ার্টেট রিজনেবল। কিন্তু শেষ মোমেন্টে লুকনো তাসটা বের করলেন। ওরা জেদ ধরে থাকলে ডাবলই দিতে হবে। স্যার, আপনি এই হাউসের চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর। হাউসের স্বার্থটা তো আগে দেখতে হবে। সেটাই তো টপ প্রায়োরিটি।'

অশোকের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল, 'তা আমি জানি। বিলিমোরিয়া সাহেব, আপনার দুশ্চিন্তা, হাজার ওয়ার্কার, এম্প্লয়িকে ডাবল মাইনে দিতে হলে হাউসে জোর ধাক্কা লাগবে, তাই তো?'

বিলিমোরিয়া আস্তে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তাই।

'এর আগেও লেবারারদের হাউসিং প্রোজেক্ট নিয়েও এই ধরনের কথা উঠেছিল। বিলিমোরিয়া সাহেব, আমি অথর্নীতির ছাত্র। লক্ষ করেছি যখনই ওয়ার্কারদের ওয়েলবিয়িং-এর জন্যে যখনই কোনও কথা ওঠে আপনারা প্যানিক হয়ে যান। স্যালারি ডাবল কেন, ট্রিপল কি ফোর টাইমস হলেও হাউসের আর্থকোয়েক ঘটে যাবে না, হালকা একটু ধাক্কা লাগতে পারে। দ্যাটস নাথিং। রাতের ঘুমে কোনও রকম ডিসটার্বেন্স হবে না।'

সান্ধু হিংস্র চিতার মতো জ্বলজ্বলে চোখে অশোকের দিকে তাকিয়েছিলেন। এবার মুখ খুললেন, 'স্যর, প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি—'

অশোক তাঁর মুখ থেকে কথাটা ছোঁ মেরে তুলে নিল, 'যা বলতে চাইছেন, বলুন। ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই—'

সান্ধু থতমত। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললেন, 'স্যর, হাউসের পরিবেশটা খুব পিসফুল ছিল। আপনি আসার—'

— 'আমি আসার পর প্রচণ্ড ডিসটার্বেন্স শুরু হয়েছে, তাই না?'

সান্ধু নিমেষে ভেতরে ভেতরে নিজেকে রণসাজে সাজিয়ে নিয়েছে। অশোকের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এগ্‌জাক্টলি' তাই। এম্প্লয়িরা কোনওরকম গোলমাল করত না। এখন লম্বা লম্বা চার্টার অফ ডিমান্ডস। এটা দিতে হবে, সেটা দিতে হবে। এমনকী আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে এনে দাও—'

অশোক সামান্য কাত হয়ে সান্ধুর চোখের ওপর চোখ রাখল, 'যা বলতে চাইছেন, অথচ বলতে পারছেন না, সেটা আমিই বলছি। ডিমান্ড নিয়ে অ্যাক্টিভিশন করতে আমিই ওদের ইনস্টিগেট করেছি— রাইট?'

'রাইট—'

হাই পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা একেকজন দেশের বিখ্যাত টাইকুন। তাঁদের মধ্যে এখন যা চলছে তা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি

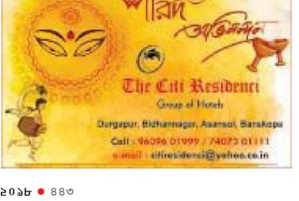

শ্রুতিকটু। বিলিমোরিয়ারা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'মিস্টার সান্ধু, প্লিজ প্লিজ কুল ডাউন। ব্যানার্জি স্যার আমাদের চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর—' তাঁর ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

মাথা থেকে উত্তপ্ত বাষ্প বের করে দিয়ে অশোক শান্ত করলেন সান্ধু সাহেব, একটু বিব্রতভাবেই বললেন, 'এক্সকিউজ মি স্যার। এক্সট্রিমলি সরি।'

'দ্যাটস অল রাইট।'

'থ্যাংক ইউ—'

এরপর কফি খেতে খেতে কিছুক্ষণ হালকা চালে গল্প-টল্প।

কফি পর্ব শেষ হলে বিলিমোরিয়া বললেন, 'আপনি একটা ভেরি মিনিংফুল সাজেশন দিয়েছেন। কালই আমরা ইউনিয়ন লিডারদের ডাকছি। আপনার পারমিশন নিয়ে এখন উঠছি—'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় অশোক ব্যস্তভাবে বলল, 'আ ফিউ মিনিটস মোর। আমার কিছু জানার আছে। আপনাদের অসুবিধে হবে?'

'নট অ্যাট অল। ইট'স আওয়ার প্রিভিলেজ।' সান্ধু বললেন। তিনি আদ্যোপান্ত পালটে গেছেন।

অশোক ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'প্লিজ বি সিটেড—'

মেম্বাররা বসে পড়লেন।

অশোক বলল, 'আমি তো এখানে মাত্র কয়েক মাস হল এসেছি। এখানকার অনেক কিছুই জানি, আবার অনেক কিছু সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা ধারণা হয়েছে। এত বড় হাউসের সমস্ত কিছু জেনে উঠতে যথেষ্ট সময় লাগবে।'

সান্ধু বললেন, 'তা তো বটেই—'

অশোক বলল, 'আমরা অনেকবার মিটিংয়ে নানা সমস্যা-টমস্যা নিয়ে কথা বলেছি, কিন্তু একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিক বাদ থেকে গেছে।'

ভট্টাচারিয়া আজ আগা-গোড়া মুখ থেকে একটি শব্দও বের করেননি। তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটা নীরব পর্যবেক্ষকের। এতক্ষণে তিনি সরব হলেন, 'আপনি কোন দিকটার কথা বলছেন স্যার—'

'আমাদের হাউস নতুন কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট, আই মিন কারখানা বসাচ্ছে?'

'হ্যাঁ স্যর, দুটো মাঝারি টাইপের ফ্যাক্টরি। একটায় মোটর গাড়ির পার্টস তৈরি করা। আর একটায় তৈরি হবে তেন আর চার বেডের ফ্যান।'

রাহেলা এই দুটো কারখানার সমস্ত খবর আগেই দিয়েছিলেন। তবু অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় হচ্ছে ফ্যাক্টরিগুলো?'

মধ্য ভারতের একটা স্টেটের নাম করলেন ভট্টাচারিয়া। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কতজনের কাজ হবে?'

অ্যাবাউট ওয়ান থাউজেন্ড টু ওয়ান থাইজেন্ড টু হানড্রেড। এক্সপ্যানশন হলে আরও লোক নেওয়া হবে।'

রাহেলা জানাননি, খুব সম্ভব জানেন না, অশোকের মনে হল, মধ্য ভারতের ওই জায়গায় ভট্টাচারিয়াদের বড় কোনও পরিকল্পনা আছে। বলল, 'ওখানে কি বড় কিছু করার কথা ভাবা হচ্ছে?'

'আপনি ঠিক ধরেছেন। ওখানে আমরা দেড় হাজার একর জমি নিয়েছি। বিদেশি কোলাবরেশনে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় অটোমোবাইল প্ল্যান্ট বসানো হবে। প্ল্যান্টটা ঘিরে আরও অনেক অ্যানিলিয়ারি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে।'

'এই প্রোজেক্টটায় কতজনের এমপ্লয়মেন্ট হবে—'

'অ্যারাউন্ড দু'হাজার—'

'মিস্টার ভট্টাচারিয়া, শুনেছি এই স্টেটে আমাদের হাউস নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রির জন্য চার হাজারের মতো জমি কিনে রেখেছে। অটোমোবাইল প্ল্যান্টটা এখানেই নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।'

অবাক হয়ে ভট্টাচারিয়া বললেন, 'সমস্ত প্রোজেক্টটা ফাইনালাইজড হয়ে গেছে। সেখানকার গভর্নমেন্ট আমাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেবে। এই বছরের শেষে আমরা ব্যাঙ্ক লোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করব। একটা মিটিং ডেকে এই প্রোজেক্টের কথা আপনাকে জানাতাম। কিন্তু হঠাৎ প্ল্যান্টটা তুলে আনার কথা ভাবলেন কেন?'

অশোক বলল, 'এই স্টেটের বেকারদের কাজ পেত।'

'স্যর, আপনি সারা দেশের বেকারদের এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা আর সোশ্যাল স্ট্রাকচার বদলে দেবার স্বপ্ন দেখেন। সব স্টেটেই কিন্তু অনেক বেকার ছেলে-মেয়ে আছে। প্রতিবছর তাদের সংখ্যাটা বেড়ে চলেছে। মধ্য ভারতের ওই স্টেটটাও এক্সেপশন নয়।'

'আমাদের এই স্টেট কিন্তু এক্সেপশন। কারণ দেশ ভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্ডারের ওপার থেকে চলে এসেছে। পার্টিশনের প্রায় সমস্ত প্রেশারটা এই রাজ্যের ওপর এসে পড়েছে। অন্য রাজ্যে আন-এমপ্লয়েডদের সংখ্যাটা অনেক, অনেক বেশি। শিল্প নিশ্চয়ই সব রাজ্যে হবে, তবে প্রায়োরিটিটা এই স্টেটকেই দেওয়া হোক।' হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে কাজকর্ম না পেলে হতাশায় কী করে বসতে পারে আপনাদের খুব একটা ধারণা নেই। হতাশা এক ধরনের মারাত্মক বিষ। সেই বিষে একটা জেনারেশন ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ভট্টাচারিয়া হেসে ফেললেন, 'স্যর, স্বপ্ন আর ইমোশন দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি হয় না। কোথায় গেলে ট্যাক্স বেনিফিট বেশি পাবে, সেখানকার সরকার কতটা কো-অপারেট করবে, চিপ লেবার পাওয়া যাবে, পলিটিক্যাল ডিসটারবেন্স নেই— এসব ভেবেই হাউসগুলো কলকারখানা বসায়। ইন্ডাস্ট্রির একমাত্র জপমন্ত্র হল— প্রফিট, প্রফিট অ্যান্ড প্রফিট— অন্য কোনও কনসিডারেশন নয়।'

অশোক একটু ভেবে বলল, 'ওটা যখন সম্ভব নয় তখন আমাদের যে চার হাজার একর আন-ইউজড জমি আছে সেখানে অন্য কোনও প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ইন্ডাস্ট্রি কি মুখের কথায় হয়? একটু আগে যে সব বেনিফিটের কথা বললাম, সেগুলো পাওয়া গেলে তবেই চলা যাবে।'

অশোক ক্রমশ নিরাশ হয়ে পড়ছিল। সে চুপ করে রইল।

ভট্টাচারিয়া তার দিকে নজর রেখেছিলেন। বললেন, 'স্যার, আপনি চান সারা দেশ ইন্ডাস্ট্রিতে ছেয়ে যাক, তবে সবার আগে এই স্টেট, কারণ এই স্টেটের ওপর প্রেশার বেশি। কিন্তু তা হবে না। আপনি তো জানেন ক'টা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের মেয়াদ শেষ হয়ে আরও একটা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো কলকারখানা বসেছে? সারা দেশে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে। গভর্নমেন্ট একটা টার্গেট ঠিক করে দিয়েছিল। তার কত পার্সেন্ট এমপ্লয়মেন্ট-লেটার পেয়েছে? লাস্ট উইকের কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ম্যাগাজিনটায় তা বেরিয়েছে— ফিগারটা দেখেছেন?'

অশোকের চোখে পড়ল। আশাব্যঞ্জক নয়। সে আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, 'এই স্টেটে আমাদের যে কারখানাগুলো আছে সেগুলোর এক্সপ্যানশন করে অনেকের এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা তো করা যায়।'

'নো স্যর। তেমন কোনও পরিকল্পনা আমাদের নেই। বরং কয়েকটা রুগ্ন ফ্যাক্টরি থেকে যে প্রোডাক্ট বেরয় তার চাহিদা অনেক কমে গেছে। কারণ আরও কয়েকটা নতুন কারখানা একই প্রোডাক্ট করছে। কম্পিটিশনটা কত টাফ বুঝতে পারছেন? তাই আপনি এই হাউসে আসার আগে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।'

'কীসের সিদ্ধান্ত?'

'ওই ক'টা ফ্যাক্টরির কিছু লোককে চাকরিতে রাখা সম্ভব হবে না।'

অশোক চমকে উঠল, 'মানে?'

'রিট্রেঞ্চ করা হবে। অবশ্য তাদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি ছাড়াও আরও এক মাসের মাইনে এক্সট্রা দেওয়া হবে।'

'এতে ওদের ফ্যামিলি নিয়ে ক'মাস বা ক'বছর চলবে। তারপর বাকি লাইফটা উপোস করে কাটাবে?'

'স্যর, বেশির ভাগ এমপ্লয়িকে যাতে উপোস করতে না হয় তাই কিছু লোককে তো স্যাক্রিফাইস করতেই হবে।'

অশোক প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'না না, আমি এই হাউসের চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমি থাকতে এটা কোনওভাবেই করতে দিব না।'

ভট্টাচারিয়া উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল।

॥ সতেরো ॥

সেই যে বিলিমোরিয়া অফিসে অশোকের চেম্বারে এসেছিলেন তারপর দশদিন কেটে গেল। এর মধ্যে ইউনিয়নের সঙ্গে কয়েক রাউন্ড দড়ি-টানাটানির পর পে-স্কেল চেঞ্জ করতে রাজি হল হাই পাওয়ার কমিটি। এমপ্লয়িদের স্যালারি দু'মাস পর থেকে দ্বিগুণ নয়, দেড় গুণ করা হবে। সিদ্ধান্তটা অবশ্য এখনও হাউসের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়নি। আজ বিকেলে তা করা হবে। তার আগে আজই দুপুরে হাই পাওয়ার কমিটি কনফারেন্স হল-এ একটা জরুরি মিটিং ডেকেছে। এই কমিটির সব মেম্বার এবং চেয়ারম্যান সেখানে তো থাকবেনই, হাউসের সব ক'টা কোম্পানির ডিরেক্টরদেরও সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অন্য দিনের মতো আজও অশোক রাহেজাকে সঙ্গে নিয়ে ঠিক দশটায় অফিসে চলে এসেছে।

এই হাউসে দু'চার দিন পর পরই মিটিং। আজকের মিটিংটার কথা পরশুদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন বিলিমোরিয়া। কী এমন ঘটেছে যাতে এত বড় একটা মিটিং ডাকতে হল? বিলিমোরিয়া বলেছেন, এই হাউসের সব কোম্পানির ডিরেক্টরদের আপনার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। সেটা তাঁরা পেশ করবেন। বক্তব্যটা কী, সে সম্বন্ধে তার জবাবে ধোঁয়াশা তৈরি করে শুধু এটুকুই জানিয়েছেন সেটা মিটিংয়েই জানা যাবে।

তার সম্বন্ধে কী বক্তব্য? পরশু থেকেই এই চিন্তাটা বারবার অশোকের মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। আজ রীতিমতো টেনশনই হচ্ছে।

ছ'সাতটা ফাইল দেখে পাশে নোট দিয়ে সই করে দিতে হবে। অন্যমনস্কর মতো পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকছে না। টাইপ-করা কালো কালো অক্ষরগুলো কেমন যেন ঝাপসা-ঝাপসা আর দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

এইভাবেই কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। রাহেজা চেম্বারের দরজার সামনে এসে বললেন, 'মে আই কাম ইন স্যার?'

অশোক একটু চমকে উঠে সামনের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আসুন—'

রাহেজা ভেতরে ঢুকে বললেন, 'স্যর, দুটো বাজতে সাত। মিটিংয়ের সময় হয়েছে—'

অশোক উঠে দাঁড়ালো, 'সরি, আই ওয়াজ এ বিট আনমাইন্ডফুল। চলুন—'

দু'জনে কনফারেন্স হল-এ চলে এল। রাহেজা ভেতরে ঢুকলেন না, হল-এর বাইরে অন্য একটা কামরায় চলে গেলেন।

আজ হাই পাওয়ার কমিটির এক্সক্লুসিভ কোনও মিটিং নয়। কমিটির মেম্বার চারজন আর হাউসের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে এই কমিটিরও চেয়ারম্যান। এই মিটিংয়ের জন্য আজ স্পেস লাগে।

কিন্তু আজকের মিটিংটা অন্যরকম। বিশাল হলঘরের মাঝখান দিয়ে 'কার্পেটে চাকা প্রশস্ত প্যাসেজ সোজা একটা উঁচু ডায়াসে গিয়ে থেমেছে। তার দু'ধারে সারি সারি গদি-আঁটা চেয়ার। প্রায় দু'শোর কাছাকাছি হবে। খুব সম্ভব একটাও ফাঁকা নেই। স্যুট-বুট পরা টাই ঝোলানো চকচকে, ক্ষুরগন্ধীর চেহারার মানুষগুলোর সারা শরীর থেকে যেন জেল্লা ঠিকরে বেরুচ্ছে। এঁরাই যে এই হাউসের নানা কোম্পানির ডাইরেক্টর এক লহমায় বোঝা যায়। প্যাসেজটা সামনেদিকে যেখানে গিয়ে ঠেকেছে সেই উঁচু ডায়াসের ওপর পরপর পাঁচটি চেয়ার। ডায়াসের দু'পাশে দুটো মাইকও দাঁড় করানো। মাঝখানের চেয়ারটা ফাঁকা। সেটার একপাশে বসে আছেন সাঙ্কু এবং আগরওয়াল, আরেক পাশে বিলিমোরিয়া এবং আগরওয়াল।

কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে গেল অশোক।

ডায়াসের চার টাইকুন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের সামনে টানা টেবিলের ওপর টানা টেবিল। সেখানে ক'টা হ্যান্ড মাইক আর জলের বোতল। ক্ষিপ্র হাতে একটা মাইক তুলে নিয়ে বিলিমোরিয়া ভারী গলায় বললেন, 'আমাদের হাউসের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসেছেন। তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।

প্রায় দু'শো শিল্পপতি চকিতে সসম্ভ্রমে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। অশোকও হাতজোড় করে এপাশে-ওপাশে ঘুরে তাকাতে তাকাতে মঞ্চে পৌঁছে গেল।

দু'ধার থেকেই মঞ্চে ওঠার সিঁড়ি। ডান পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল অশোক। মাঝখানের ফাঁকা চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'বসুন স্যর, বসুন—'

অশোক হাতজোড় করেই ছিল। মঞ্চের নীচে এবং উপরে যে শিল্পপতিরা রয়েছেন, খুব বিনীতভাবে বলল, 'অনুগ্রহ করে আপনারা আগে বসুন, তারপর আমি বসছি।'

সবাই বসে পড়লে বিলিমোরিয়া মঞ্চের ডান দিকের খাড়া মাইকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করলেন, 'গুড আফটারনুন, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের অত্যন্ত জরুরি মিটিংটা আরম্ভ করার আগে সামান্য কিছু বলার আছে। বেশি সময় নেব না, কারণ এই মিটিং-এর পর একটা প্রেস কনফারেন্স আছে, সেখানে আমরা হাই পাওয়ার কমিটির মেম্বাররা আমাদের হাউসের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানিয়ে দেব। আশা করি, কাল মর্নিং এডিশনের হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি, সব ভাষার পেপারগুলোতে বেরিয়ে যাবে। নানা গোলকধাঁধায় যখন পাক খাচ্ছি তখন আমাদের চেয়ারম্যান, যাঁকে আমরা স্যার বলি, তিনি অতি মূল্যবান অ্যাডভাইস দিয়ে সঠিক পথের দিশাটা দেখিয়ে দেন। সব জট ছাড়িয়ে যায় এজন্যে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ—'

এত ভক্তির কারণটা কী? বিলিমোরিয়া চতুর খেলোয়াড়। তিনি এক হাই পাওয়ার কমিটির অন্য তিন মেম্বার, তাঁর তিন জিগরি দোস্ত, এক ডালকা পাঁড়ি। এত ভক্তি কথার মারপ্যাঁচে এত তৈলমর্দন— কেমন একটা খটকা লাগছে।

বিলিমোরিয়া বলে চলেছেন, 'ভূমিকা শেষ। এবার আজকের মিটিংয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক।' বলেই অশোকের দিকে তাকালেন, 'স্যার, আপনি এখানে এসেছেন চার মাস আঠারো দিন। আপনার সম্বন্ধে হাউসের নানা কোম্পানির ডাইরেক্টরদের সঙ্গে ছোটখাট দু-একটা মিটিংয়ে ছাড়া আপনার খুবই কম দেখা হয়েছে। এই ক'মাসে আপনার সম্বন্ধে ওঁদের কেমন ধারণা ওঁরা আমাদের বলতে চেয়েছিলেন। আমরা জানিয়েছি, স্যারকেই সামনাসামনি জানান। সেই কারণেই এই মিটিং। আপনার আপত্তি নেই তো?'

অশোক হকচকিয়ে গেল, মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোনও খোপ থেকে মারণাস্ত্রটা বেধহয় বের করেছেন বিলিমোরিয়া। স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গেল তার, পেশিগুলো শক্ত। চাপা ভাঙা গলায় বলল, 'না, আপত্তি নেই—'

'থ্যাংক ইউ। হলঘরে নানা কোম্পানির প্রায় দুশো জন ডিরেক্টর আছেন। তাঁদের সবাইকে নয়, পনেরো-ষোলোজনকেই শুধু ডাকব। সবাইকে ডাকলে অনেক সময় লাগবে।' বলেই টেবিল

থেকে হ্যান্ড মাইক তুলে নিলেন বিলিমোরিয়া। তাঁর চোখ চলে গেল সামনের দিকে, 'মিস্টার সহায়, প্লিজ ডায়াসে এসে ওই মাইকে আপনার ধারণাটি জানান। তিন মিনিটের বেশি সময় দেওয়া যাবে না।'

বিপুল আকারের মিস্টার সহায়, মঞ্চে উঠে ডান পাশের মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বিলিমোরিয়া সাহেব আমাকে তিন মিনিট সময় দিয়েছেন। আমি এক দু'মিনিটের মধ্যেই যা বলার বলছি। সোমদের চ্যাটার্জি সাহেব যখন চেয়ারম্যান ছিলেন, আমাদের সবাইকে, তাঁদের মধ্যে হাই পাওয়ার কমিটির মেম্বাররাও ছিলেন, একদিন এই কনফারেন্স হল-এ ডেকে বলেছিলেন, ব্যানার্জি সাহেবকে এনে তাঁর জায়গায় বসাবেন। অশোক ব্যানার্জি সাহেব নাকি কী একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চান। আমরা আপত্তি করিনি। কারণ আমাদের হাউস আজ যে হাইটে পৌঁছেছে তা চ্যাটার্জি সাহেবের জন্য। তাঁর কনট্রিবিউশন সবচেয়ে বেশি। তিনি এই হাউসের পিলার, আমাদের গাইড। তাঁর কথাই এখানে শেষ কথা। ব্যানার্জি সাহেব এলেন। আশা করেছিলাম, তিনি আমাদের হাউসকে আরও অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ব্যানার্জি সাহেব পর পর হাউসের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করে চলেছেন। আমি এর সমর্থন করি না। থ্যাংক ইউ—'

এরপর একে একে শিল্পপতিরা এসে বাধা গতে একই কথা একই সুরে বলে যেতে লাগলেন।

অশোক দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এই লোকগুলো কী চায়, বোঝা যাচ্ছে না। তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। কপালে দানা দানা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

চোদ্দোজন শিল্পপতির পর পনেরো নম্বর মঞ্চে এসে মাইকের সামনে এসে বললেন, 'আমার আগে যাঁরা যা বলে গেছেন আমি তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। হাউসের চরম স্বার্থ-বিরোধী কাজের জন্য আমি শুধু অশোক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চাই। আপনারা রাজি—'

সমস্ত হলঘর জুড়ে হইহই। — 'রাজি— রাজি—'

পনেরো নম্বর বললেন, 'আপনাদের সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ। এবার বিলিমোরিয়া সাহেব যা করার করবেন।'

তিনি চলে গেলেন। বিলিমোরিয়া মাইক ধরলেন, 'মুখে বললে হবে না, এই নো-কনফিডেন্স মোশনটা ব্যালটের মাধ্যমে পাশ করাতে হবে। কারণ, যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের সবাই যে অনাস্থার পক্ষে তা নাও হতে পারে। আমরা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার পোল চাই।' বলে হলঘরের ডান পাশের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। সেখানে একটা আধখোলা দরজার বাইরে দু'জন ইউনিফর্ম পরা বেয়ারা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তিনি তাদের দিকে হাত তুললেন।

শশব্যস্তে দুই বেয়ারা মঞ্চের পাশে এসে দাঁড়াল। দু'জনের হাতে দুটো বড় চামড়ার ব্যাগ। বিলিমোরিয়া তাদের বললেন, 'ব্যাগের ভেতর কী আছে তোমরা জানো। একটায় সাদা খাম, অন্যটায় সাদা কাগজ। সামনে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের সবাইকে একটা করে খাম আর কাগজ দিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গিয়েই দাঁড়াবে।'

বিলিমোরিয়ার চোখ এবার নীচের শিল্পপতিদের দিকে চলে গেল, 'আপনারা ব্যালট পোলের ব্যাপারটা জানেন। কাগজে 'রাজি' কি 'রাজি নই' লিখে নিজের নিজের সিগনেচার দিয়ে কোম্পানির নাম আর ডেট দিয়ে খামে পুরে বেয়ারাদের হাতে দেবেন। তারা আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে।

সমস্ত প্রক্রিয়াটা শেষ হতে আধঘণ্টা লাগল। ব্যালট পেপারগুলো বিলিমোরিয়াদের হাতে চলে আসার পর খোলা শুরু হল। এতে আরও এক ঘণ্টা লাগল।

এরপর ফল ঘোষণা। বিলিমোরিয়া ফের মাইকের সামনে। —

'গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, একটা ভোটও অশোক ব্যানার্জির পক্ষে পড়েনি, সবই বিপক্ষে। এখানে যাঁরা আছেন তাঁর ওপর কারও আস্থা নেই। যাই হোক, অশোক ব্যানার্জি স্যারকে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

বিলিমোরিয়া ফিরে এলেন। অশোক উঠে পড়েছিল। একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, 'আমাকে বিদায় করার পরিকল্পনাটা কবে থেকে চলছিল?' তার গলায় হাসির ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

মুখটা পাংশু হয়ে গেল বিলিমোরিয়ার। — 'কী বলছেন স্যার, কীসের পরিকল্পনা, কীসের—' তাঁর কণ্ঠস্বর ফ্যাসফেসে শোনায়।

অশোক বলল, 'এই প্রশ্নটা আপনার মুখে মানায় নাকি? আজ মিটিং ডেকে এই ডার্টি গেমটা যে খেলা হল, সেই ছকটা কার মাথায় বেরিয়েছে?'

আরও চুপসে গেলেন বিলিমোরিয়া। তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের উপর।

অশোক আর দাঁড়াল না। মাইকের সামনে চলে গেল। বলতে শুরু করল, 'আমাকে নিয়ে যে দুর্দান্ত নাটকটা হল তার কোনও প্রয়োজন ছিল কি? আপনারা স্ট্রেট বলতে পারতেন, 'স্যার, আপনি দয়া করে হাউসের টপমোস্ট পদটি আঁকড়ে থাকবেন না। আমি এক মুহূর্তও থাকতাম না। আজ বাড়ি ফিরে ঠান্ডা মাথায় এরপর কী করব, না করব, তার একটা সিদ্ধান্ত নেব। কাল অফিস আওয়ার্সের মধ্যেই আপনারা জানতে পারবেন। থ্যাংক ইউ—'

সমস্ত হলঘর জুড়ে কলরোল শুরু হল। শিল্পপতিরা এক সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বোঝার আগ্রহও নেই। সে তার চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়াল কিন্তু বসল না। হাই পাওয়ার মেম্বাররা উঠে দাঁড়ালেন।

অশোক বলল, 'মিটিং আশা করি শেষ হয়েছে—'

বিলিমোরিয়া বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, আমি গিয়ে সেটা জানিয়ে দিচ্ছি—'

মাইকে সমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ থেকে নেমে প্যাসেজ ধরে সোজা দরজাটার দিকে সোজাসুজি হাঁটতে লাগল। বিলিমোরিয়ারা সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। আর সমানে বলে যাচ্ছে—

'স্যার সাউথ কোনও ডিসিশন নেবেন না। আমরা কাল আপনার সঙ্গে বসতে চাই—'

অশোক উদাসীন গলায় বলল, 'কাল আসুক তখন দেখা যাবে।' বাইরে এসে রাহেজাকে নিয়ে নিজের পিঠটা চেয়ারের পেছন দিকে হেলিয়ে চোখ বুজল।

রাহেজা অন্য সময় অশোককে চেম্বারে পৌঁছে দিয়েই নিজের রুমে চলে যান। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। পার্লও উঠে পড়েছে। দু'জনেরই কেমন যেন টেনশন হচ্ছিল।

কয়েক মিনিট এইভাবে কাটল। চেম্বার একেবারে নিঝুম। আচমকা বাইরে থেকে তুমুল চিৎকার এবং স্লোগানের আওয়াজ উঠে আসতে লাগল।

চোখ মেলে ব্যস্তভাবে সোজা হয়ে বসল। — 'এত হল্লা কেন মিস্টার রাহেজা? আপনি কছু জানেন? — পার্ল, আপনি?'

দু'জনেই মাথা নাড়ল, 'না স্যর—'

'মিস্টার রাহেজা, আপনি কাইন্ডলি দেখে আসুন। একটু কষ্ট হবে—'

'রাহেজা বললেন, 'না না, কষ্ট কেন হবে। ইট'স আ প্লেজার।'

পার্ল দাঁড়িয়েই আছে। অশোক হাসিমুখে বলল, 'বসুন বসুন।' পার্ল বসল ঠিকই কিন্তু তার চোখ-মুখে চাপা উৎকণ্ঠা। লহমায় তার মনের কথাটা পড়ে ফেলল অশোক, মিটিং থেকে ফিরে এসে চোখ বুজে বসে পড়তে দেখে খুব সম্ভব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। মিটিংয়ে আজ কী হয়েছে, সেটা জানতে চাইছে। কিন্তু সাহস করে বলতে পারছে না।

অশোক বলল, 'কাল আপনার কিউরিয়াসটি মিটিয়ে দেব। এখন তিন মগ কফি। আমার, আপনার আর রাহেজা সাহেবের।'

'ইয়েস স্যর—' একজন বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বলল পার্ল।

পার্লের টেনশন একটু কমেছে ঠিকই, কিন্তু কৌতূহলটা থেকে গেছে। কিছু দিন ধরে অশোক লক্ষ করছে মেয়েটা তার দিকে একটু বেশিই ঝুঁকে পড়েছে। তার সম্বন্ধে খুব কৌতূহল। সে যদি কোনও কোনও ক্রাইসিসে পড়ে পার্ল ভেতরে ভেতরে উতলা হয়ে পড়ে। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু অশোক চুপচাপ থাকে। রাহেজা মনে মনে হাসে।

রাহেজার আসতে দেরি হচ্ছে। লঘু সুরে এটা সেটা নানা ধরনের গল্প করে সময়টা কাটাতে থাকে।

পনেরো মিনিট পর কফি এবং রাহেজা একসঙ্গে হাজির। একটা কফি মগ তুলে নিয়ে হালকা চুমুক দিয়ে অশোক রাহেজার দিকে তাকাল।

রাহেজার হাতেও কফি মগ। হাসিমুখে বললেন, 'ভেরি গুড নিউজ স্যার। আমাদের হাউস কনফারেন্স হল-এ আপনাদের মিটিংটার পর প্রেস কনফারেন্সে হাউসের সব এমপ্লয়ির পে-স্কেল বাড়ানোর ডিসিশনটা সাংবাদিকদের জানিয়ে দিয়েছে। খবরটা হাউসে ছড়িয়ে গিয়েছিল, তাই এমপ্লয়িরা বাইরে বেরিয়ে সেলিব্রেট করছে। আওয়াজটা তারই। আপনার নামে অনবরত স্লোগান দিচ্ছে।'

'মানে—' বেশ অবাকই হল অশোক।

'বলছে আপনার জন্যেই তাদের বহুদিনের দাবিটা মিটল। লোকগুলো একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে।'

অশোক একটু হাসল। ঘড়িতে এখন ছ'টা সতেরো। বলল, 'চলুন, সন্ধে নেমে গেছে। অন্য কোথায় নয়, সোজা বাড়ি চলে যাব। মিস শেঠনা, আপনি ফাঁকা চেম্বারে বসে আর কী করবেন। বেরিয়ে পড়ুন। গুড ইভনিং।'

পার্ল উঠে পড়েছে, 'ভেরি গুড ইভনিং।'

'ও একটা কথা—'

'কাল কখন অফিসে আসব, বুঝতে পারছি না। সাড়ে দশটায় আপনাকে একটা ফোন করব—'

'ইয়েস স্যর—'

অশোক দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পাশে সামান্য দূরত্ব রেখে রাহেজা।

লিফটে নীচে নেমে আসতেই চোখে পড়ল, অফিস কমপাউন্ডের ভেতরে এবং বাইরে তাদের হাউসের হাজার তিনেক এমপ্লয়ি সত্যিই যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। আবির খেলছে। এ ওকে জড়িয়ে ধরছে। কেউ কেউ ড্রাম পেটাচ্ছে, স্লোগান দিচ্ছে, 'বড়সাহেব, জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ইত্যাদি। ডালহৌসির এই এলাকাটা জুড়ে আজ অকাল বসন্ত।

লিমুজিন বাইরের রাস্তায় আসতেই উন্মাদনা, শোরগোল আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। 'সেলাম বড়ে সাহেব', 'বড় সাহেব', 'প্রণাম, নমস্কার', 'আপনি আমাদের ভগবান।' 'আপ বহুৎ মেহেরবান', চারদিক থেকে অবিরাম এসব কানে আসছে অশোকের। এমপ্লয়িদের স্যালারি বাড়াবার জন্য হাই পাওয়ার কমিটিকে সে চাপ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সবটাই যে তার জন্য হয়েছে তা কিন্তু নয়। ইউনিয়নও প্রেশার দিয়েছে। তা ছাড়া হাই পাওয়ার কমিটিও বুঝতে পেরেছে কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি না মেনে উপায় নেই। কিন্তু এসব বললেও তারা আদৌ বিশ্বাস করবে কি না কে জানে। এদের একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে তাদের জন্য যা কিছু ভালো হচ্ছে, সমস্তটুকু কৃতিত্ব তারই।

কর্মীরা সরে সরে পথ করে দিল। অশোকদের গাড়িটা মিশন রো পেরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে দু-তিনটে টার্ন নিয়ে গতি বাড়িয়ে রেড রোডের দিকে দৌড়তে লাগল।

অশোক আর রাহেজা অফিসে আজকের নানা ঘটনা নিয়ে এলোমেলো কথা বলছিল। শুধু হাউসের একশোরও বেশি কোম্পানির ডিরেক্টরদের নিয়ে সে ভেরি ভেরি আর্জেন্ট মিটিংটা হয়েছে সেটা বাদ দিয়ে।

কথা বলতে বলতে অশোক লক্ষ করছে, রাহেজাকে একটু অস্থির অস্থির মনে হচ্ছে। চোখে মুখে খুব চাপা উৎকণ্ঠা। কিছু একটা বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। অনেকটা পার্লের মতো। তাঁর মনোভাবটা আন্দাজ করে নিল অশোক। খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছেন রাহেজা সাহেব?'

রাহেজা চমকে উঠলেন, 'কই, কিছু না তো স্যার—'

'ভাবছেন। আজকের মিটিংয়ে কী ঘটেছে তাই নিয়ে টেনশন হচ্ছে নিশ্চয়ই।'

মুখ নামিয়ে চুপ করে রইলেন রাহেজা। তাঁর কাঁধে একটা হাত রাখল অশোক। — 'আজ কিছু জানতে চাইবেন না। কাল আপনাকে সব বলব।'

রাহেজা মুখ তুলে আস্তে মাথা নাড়লেন।

অশোক বলল, 'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

রাহেজা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'অবশ্যই—'

অশোক বলল, 'মোটামুটি আমার বয়েসের কোনও যুবকের মাপে খুব কম দামের, যতটা সস্তা হয় একটা ফুলপ্যান্ট, একটা শার্ট আর একটা গেঞ্জি কিনে আনবেন। ও হ্যাঁ, একজোড়া সস্তার চটিও চাই। আপনার পায়ের মাপে হলেই হবে। আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গড়িয়াহাটে চলে যাবেন। ওখানেই সব পাবেন।'

রাহেজা হতভম্ব। — 'এগুলো কি কারওকে দেবেন স্যার?'

'কালই সব জানতে পারবেন।'

আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস হল না রাহেজার।

॥ আঠেরো ॥

পরদিন রুটিনমাফিক বেড টি, চানা তরুণী, ম্যাসাজ, স্নানটান। সব পর্ব সারা হলে ব্রেকফাস্টের টেবিলে।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ, আচমকা ফোন বেজে উঠল। সেটা তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই অন্য প্রান্ত থেকে পরিচিত ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'অশোক, আমি সোমদেব চ্যাটার্জি—'

'বুঝতে পেরেছি। ইন ফ্যাক্ট, আপনার এই ফোনটাই আমি এক্সপেক্ট করছিলাম।'

'সাড়ে ন'টায় আমি তোমার ওখানে চলে আসছি। প্লিজ ওয়েট কোরো—'

রাহেজা এখনও আসেননি। তাঁর স্ত্রী প্রায় বারো মাসই নানা রোগে ভোগেন। হয়তো তার কোনও একটার প্রকোপ বেড়েছে। রাহেজা তাই নিয়ে হিমশিম। তাই দেরি হচ্ছে।

দ্রুত খাওয়া সেরে তেতলায় তার বেডরুমে গিয়ে নতুন প্যান্ট-শার্টের প্যাকেটটা খুলে খেলো প্যান্ট-শার্ট বের করল অশোক। কালই এগুলো কিনে এনেছেন রাহেজা। গায়ের পোশাক ছেড়ে নতুন প্যান্ট-শার্ট পরে ফেলল অশোক। তারপর সস্তার নতুন চটি পায়ে গলিয়ে নিল। বিছানার পাশে একটা ছোট সাইড টেবিল। সেটায় ওনার কিছু বই-টই এবং টেবল ল্যাম্প। শুয়ে শুয়ে বই-টই পড়ার জন্য। সেটার একধারে একটা লম্বা, সাদা, মুখ-আঁটা খাম পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে ফের নীচের তলায় নেমে সোজা ড্রইং রুমে।

রাহেজা সেখানে বসেছিলেন। অশোকের দিকে তাকিয়ে তিনি হতচকিত। তাঁর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'গুড মর্নিং স্যর। কিন্তু এই বাজে প্যান্ট-ট্যান্ট আপনি নিজের জন্যে কিনতে বলেছিলেন?'

আস্তে মাথা নাড়ল অশোক, 'হ্যাঁ—'

এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ারের সর্বেসর্বা কিনা, এই পোশাকে অফিসে যাবেন! ভাবা যায় না। রাহেজার মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যেতে লাগল। তিনি কী বলতে যাচ্ছিলেন, অশোক তার নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বুঝিয়ে দিল এ বিষয়ে সে আপাতত উত্তর দেবে না। বলল, 'প্লিজ বসুন—'

রাহেজা বসে পড়লেন। একটা টেবিলের উপর খামটা রেখে

অশোকও বসল।

ছাড়া ছাড়া কিছু কথা হল। এলোমেলো, অর্থহীন।

ঠিক সাড়ে ন'টায় সোমদেব চ্যাটার্জি চলে এলেন। অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভেরি গুড মর্নিং স্যর। প্লিজ বি সিটেড—'

'গুড মর্নিং। তুমিও বোসো—'

দু'জনেই বসে পড়ল। রাহেজা জানেন, এই সময় তাঁর থাকাটা আদৌ বাঞ্ছনীয় হবে না। তিনি নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সোমদেব বললেন, 'কাল স্পেশাল মিটিংয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হল?'

অশোক বলল, 'সেটা কি আপনার জানতে বাকি আছে? শুধু জানেনই না, আপনি যে ওই মিটিটার প্ল্যান করেছেন, বাংলায় একটা কথা আছে না, 'নাটের গুরু'— আপনি তো তাই-ই। অস্বীকার করতে পারেন?'

সোমদেব হাসলেন, 'ধরে ফেলেছ? অবশ্য আমি জানতাম তোমার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না।'

'স্পেশাল মিটিং ডেকে ওই ট্রিকি গেমটা কেন খেললেন?'

'আমাদের হাউসের স্বার্থ রক্ষা করতে। তুমি যেসব স্টেপ নিয়েছ বা নিতে যাচ্ছিলে তা ঠেকাবার সাধ্য বিলিমোরিয়াদের নেই। তাই—'

সোমদেবকে শেষ করতে দিল না অশোক। 'তাই আড়ালে থেকে আপনাকে রাইফেল তুলে নিতে হল?'

'ওই যে তোমাকে বললাম ট্রেড ইন্ডাস্ট্রি বিজনেস হাউস প্রফিট ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। যা বোঝে তা হল প্রফিট। নাথিং এলস—'

'আপনার শেখানো এই বুলিগুলো কালই আমি শুনেছি। হাউস হিউম্যান কোনও অ্যাজেন্ড থেকে ভাবে না?'

'হাউসগুলো চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন নয়। তবে একটু-আধটু ডোনেশন যে করে না তা নয়—' বলতে বলতে তাঁর নজর এসে পড়ল অশোকের পোশাকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কপাল কুঁচকে গেল, 'যাচ্ছেতাই কী সব পরেছ!

শ্রেণীচরিত্র মিলিয়েই তো পোশাক হবে—'

'মানে—'

টেবিল থেকে সেই খামটা তুলে সোমদেবকে দিল অশোক। —'এইটা—'

সোমদেব অবাক, 'কী আছে এতে?'

একটু মজা করতে ইচ্ছা হল অশোকের, 'ম্যাজিক। প্লিজ খুলুন—'

সোমদেব খামের ভেতর থেকে ভাঁজ করা লম্বা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে হাতে লেখা কয়েকটা লাইন দেখতে পেলেন। দ্রুত পড়েই চোখ তুললেন। তাঁকে বিভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে। —'তুমি রেজিগনেশন দিয়েছ?'

অশোক হাসল, 'তাই তো লেখা আছে। কোনও ভুল নেই। আমি আর এত বড় হাউসের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর নই, বস্তির ছেলে। তার গায়ে দামি দামি স্যুট-বুট মানাবে না, ওসব পরে আমাদের পাড়ায় ঢুকলে চারদিক থেকে ইট-পাথর উড়ে আসবে; রাস্তার কুকুরগুলো গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পিছু নেবে। এসব তো তারা কখনও দেখে না—'

'আমার অনুরোধ, তুমি থেকে যাও। তোমাকে অনেক বড় একটা পোস্ট দেওয়া হবে।'

'স্যর, আমি নিজের কোনও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আসিনি। এসেছিলাম একটা মিশন নিয়ে। সে যাক—'

'তুমি কি ডিফিটিস্টদের মতো পালাতে চাও?'

'আমি কি টোটালি ডিফিটেড?' হাউসের সব এমপ্লয়ির জন্যে হাউসিং প্রোজেক্ট তৈরির ব্যবস্থা করা, পে-স্কেল বদলে দিতে সাহায্য করা— এগুলোকে কী বলবেন?'

'আই অ্যাডমিট এটা সাকসেস, কিন্তু সোশ্যাল প্যাটার্ন পাল্টে দেবার পক্ষে কতটুকু? ভেরি ভেরি ইন-সিগনিফিকান্ট।'

'মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া সোশ্যাল প্যাটার্ন পাল্টাবে কী করে? সে জন্যে ব্যাপকভাবে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি তৈরি করা। আর সেটা করতে হলে দুটো বড় সেক্টর রয়েছে। কৃষি আর ইন্ডাস্ট্রি। কৃষিতে কোটি কোটি মানুষ কাজ করছে। কিন্তু প্রতিবছর কলেজ, ইউনিভার্সিটি, টেকনিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো থেকে যে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে বেরুচ্ছে তাদের জন্যে কাজ চাই। কৃষির এতটুকু ক্ষতি না করে সারা দেশে ব্যাপকভাবে কল-কারখানা বসানো হোক। আমি চেয়েছিলাম আপনাদের হাউস এ ব্যাপারে একটা বড় রোল প্লে করুক। সেটা দেশের অন্য সব হাউসগুলোর পক্ষে ইন্সপিরেশনের কাজ করবে। আমি চেয়েছিলাম, পুরনো কারখানার এক্সপ্যানশন, নতুন নতুন কারখানা বসাতে। কিন্তু আমার কথা কি শোনা হল? স্পেশ্যাল মিটিং ডেকে ভোট করে ব্রুট মেজরিতে জিতে আমার বিদায়-ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়া হল।'

সোমদেব খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, ইউটোপিয়া। স্বপ্ন। এই স্বপ্ন কি কখনও পূরণ সম্ভব? ইমপসিবল।'

'তবু আমি স্বপ্নটা ছাড়ছি না।'

'এক কাজ করো।'

'বলুন—'

'একটা রাউন্ড লড়েই রণে ভঙ্গ দিচ্ছ কেন?' তুমি তো ফাইটার। আরও অনেক রাউন্ড তো আছে। লড়াইটা চালাও না!'

'আমার হল ওয়ান-ম্যান আর্মি। আমার বিরুদ্ধে আপনাদের হোল হাউস। পুরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড। হাজার হাজার অদৃশ্য রাইফেল আমার দিকে তাক করা রয়েছে। তবে আমি আসব, আরও প্রিপেয়ার্ড হয়ে।'

'যেদিন, যখন হিজে আসবে। এই হাউসের দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা থাকবে। তুমি যখন আসবে দেখবে দেশের অর্থনীতি পাল্টে গেছে।'

'তার জন্যেও তৈরি হয়ে আসব।'

'গুড। আই স্যালুট ইওর স্পিরিট—'

'চললাম। গায়ে যা জামা-প্যান্ট রয়েছে সেসব এই হাউসের টাকায় কেনা। সেই সঙ্গে ক্যাশ পনেরোটা টাকা বাস-ট্রাম ভাড়ার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। এই ঋণটুকু থেকে গেল।'

সোমদেব অপ্রস্তুত। —'আরে, এই হাউসের চেয়ারম্যান কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে প্রায় পাঁচ মাস ছিলে। কয়েক লক্ষ টাকা তোমার প্রাপ্য। এক উইকের মধ্যে পাঠিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ মিস্টার চ্যাটার্জি। এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ দিয়েছিলেন, সেটাই যথেষ্ট। চলি—' হাতজোড় একটা নমস্কার করে পায়ে পায়ে ড্রইং রুমের বাইরে চলে এল অশোক।

রাহেজা বাইরে দরজার একধারে বিষাদগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। অশোকের সঙ্গে সঙ্গে লিফটে ঢুকে সুইচ টিপলেন। তারপর বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'ড্রইং রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শুনেছি। আবার কবে আসবেন স্যর?' তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে বুজে গেল।

'দেখি—'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন আসবেন।'

লিফট নীচে নেমে এলে বাগানের ভেতর দিয়ে গেট পর্যন্ত এলেন রাহেজা। বাইরে বেরিয়ে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল অশোক। পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাহেজা। এমন আশ্চর্য যুবক আগে আর তিনি কখনও দেখেননি।

• এই উপন্যাসের সব চরিত্র, ঘটনাবলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এর সঙ্গে বাস্তবের যদি কোনও মিল থাকে তা সম্পূর্ণ আকস্মিক। এ জন্য লেখকের কোনও দায়িত্ব নেই।

অলংকরণ: ইন্দ্রনীল ঘোষ

সমাপ্ত